পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন

উপমডিউল ১

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
নাহিদ পারভীন, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
রিফফাত জাহান নাহরীন, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সীমা রানী সরকার, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
মোস্তাক ইমরান, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)

তাশনুভা শারমীন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই জয়দেবপুর
ইভালিন রাফিয়া, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই সোনাতলা

পরিমার্জনে সহযোগিতা

নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নাসির উদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
এ. কে. এম রাফেজ আলম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
হাসান মামুন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই সুনামগঞ্জ
সোহেলী আক্তার, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই সুনামগঞ্জ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্‌মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ ম্যানুয়াল পরিচিতি

শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১৯টি অধিবেশন রাখা হয়েছিল।পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) বিশেষজ্ঞগণের ১৫ টি পিটি আই এ পাইলটিং কার্যক্রম মনিটরিং এ প্রাপ্ত ফলাফল ও পিটি আই এর সুপারিন্টেনডেন্ট,সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট এবং ইন্সট্রাক্টরগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত এর ভিত্তিতে এ মডিউলটি পরিমার্জন করে ১৯টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বিভাজন করা হয়েছে। মডিউলের প্রথম দিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি-কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি ও কৌশল:

শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ সম্পর্কে জেনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকাশ ও শিখনতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি বেইজড প্রায়োগিক উদাহরনের অবতারনা করা হয়েছে। শিখন শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে শিশু কেন্দ্রিক খেলা অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ উপস্থাপন, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইক্রোটিচিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিশুর শিখন আচরণ সম্পর্কে অবগত হয়ে শিক্ষকগণের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন শেখানো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

১. শিশুর বিকাশ এবং শিখন আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির বিকাশ ও প্রয়োগ সাধন করা;
২. শিক্ষার্থীদের শেখার দক্ষতা বিকাশের কৌশল অনুশীলন করা;
৩. শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতাগুলো অর্জন করানোর কৌশল আয়ত্ব করা;
৪. শিশুর বিকাশে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমগুলো অনুশীলন করা;
৫. শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা নিশ্চিত করা;
৬. শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যার কৌশল অনুশীলন করা।

ম্যানুয়াল ব্যবহারে প্রশিক্ষকের করণীয়

অধিবেশন পরিচালনার পূর্বে ঃ

- শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জড়তাভঙ্গের জন্য কোনো আনন্দদায়ক কাজ করা
- তথ্যাবলি, লিফলেট ও প্রাসঙ্গিক সহায়ক তথ্য পড়া
- প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র ফটোকপি করে রাখা
- সংশ্লিষ্ট ভিডিও লিঙ্ক চেক করে কতটুকু দেখাতে হবে তা নোট করে রাখা
- অধিবেশন পরিচালনায় সহায়কের করণীয় অংশের নির্দেশনা অনুক্রম জেনে নেওয়া
- পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশন পর্যালোচনায় দলগত প্রতিযোগিতার আয়োজনের প্রস্তুতি রাখা
- ব্যবহার্য উপকরণের তালিকা তৈরি করা ও তালিকা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করা
- অধিবেশন পরিচালনার ধাপ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপকরণ সাজিয়ে রাখা
- অধিবেশন কক্ষ পরিচ্ছন্ন ও বিন্যস্ত করা
- ফ্লিপচার্ট, বোর্ড, প্রজেক্টরসহ অন্যান্য উপকরণ যথাস্থানে স্থাপন করা ও সঠিকতা যাচাই করে নেয়া
- অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করা

অধিবেশন চলাকালীন ঃ

- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বা অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের বলতে উৎসাহিত করা
- অংশগ্রহণকারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা
- ধাপ অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা
- সকলের সঙ্গে দৃষ্টি সংযোগ রেখে কথা বলা
- সময়েরর সঠিক ব্যবহার করা
- অংশগ্রহণকারীদের সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিবেশনের কাজ শেষ করা
- অধিবেশনে উদ্দীপকের ব্যবহার করা
- প্রশিক্ষণকক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা
- বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা
- প্রত্যেক অধিবেশনের শিখনফল ও কার্যাবলির বিস্তারিত বিবরণ জানা
- প্রসঙ্গে থেকে অধিবেশনের মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা
- প্রশিক্ষণার্থীদের কাজগুলোকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- দলগত কাজের সময় পরিবীক্ষণ করা এবং প্রশিক্ষক নিজেকে দলের একজন সদস্য মনে করা
- সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- দল বিভাজনের জন্য আকর্ষণীয় কৌশল ব্যবহার করা
- দল গঠনের ক্ষেত্রে সমতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- প্রত্যেক কাজে সকলের (নারী-পুরুষ) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা
- হাসি-খুশি থাকা ও কথা বলার সময় যথাযথ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা
- শ্রবণযোগ্য স্বরে চলিত রীতিতে কথা বলা

- প্রত্যেক দলের জন্য একজন অগ্রগামী প্রশিক্ষণার্থীকে মেন্টর হিসেবে কাজ করানো যেতে পারে

অধিবেশন পরিচালনার পর

- উপকরণ পরবর্তী অধিবেশন পরিচালনার জন্য গুছিয়ে রাখা
- অধিবেশন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা
- পরিচালিত অধিবেশন সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন (Self-reflection) করা
- অনুচিন্তন ছকের আলোকে অংশগ্রহণকারীর অস্পষ্টতা (ধারণাগত ও প্রায়োগিক) জানা
- পরবর্তী দিনের জন্য আসন বিন্যাস ঠিক করা

পূর্ববর্তী দিনের অধিবেশন পর্যালোচনাঃ

- অংশগ্রহণকারীদের দুইটি বা কয়েকটি দলে ভাগ করা
- প্রত্যেক দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করা
- পূর্বদিনের আলোচিত বিষয়সমূহ হতে একে অপরকে প্রশ্ন করতে বলা
- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একদলকে বিজয়ী ঘোষণা করা
- পরবর্তীতে পরস্পর অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ দেওয়া
- প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করা।

উপমডিউল: ২.১ শিশুর বিকাশ ও শিখন আচরণ

অধিবেশন সূচী

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	শিশু ও শিশুর আচরণ	১০
২	শিশুর চাহিদা ও অধিকার	১৪
৩	শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ	২০
৪	শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান	২৪
৫	শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা ও প্রতিবন্ধকতা	৩১
৬	শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়	৩৬
৭	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ও করণীয়	৪১
৮	শিশুর শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ	৪৬
৯	শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ	৪৮
১০	শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ	৫১
১১	সামাজিক-আবেগিক বিকাশ	৫৫
১২	শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনা	৫৯
১৩	শিশুর শিখন ও বিকাশে খেলার গুরুত্ব	৬৪
১৪	শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণে করণীয়	৭১
১৫	শিশুর বৈচিত্র্যময় শিখন চ্যালেঞ্জ	৭৬
১৬	শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা	৭৯
১৭	শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা কৌশল	৮৪
১৮	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা	৮৮
১৯	জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা	৯৩

সহায়ক তথ্য-০১	অধিবেশন ১: শিশু ও শিশুর আচরণ

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বয়সভেদে শিশুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশু ও শিশুর বৈশিষ্ট্য

শিশু: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিশু নীতি অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। প্রতিটি শিশু আলাদা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা। শিশুর রয়েছে নিজস্ব একটা জগৎ এবং শিশুর এই জগৎ হলো হাসি ও আনন্দময়। শিশুদের সঠিকভাবে বুঝতে এবং সক্রিয় রাখতে হলে তাদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। শিশুর শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রত্যেক শিক্ষক মেন্টরের জন্য অত্যাবশ্যক।

শিশুদের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

- প্রতিটি শিশু এক নয়। প্রত্যেক শিশুই অপর শিশু থেকে আলাদা।
- শিশুদের পছন্দ, চাহিদা ও শিখনের ধরন আলাদা আলাদা হয়, যা মূলত গড়ে ওঠে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশের ওপর।
- শিশু আদর ও ভালোবাসা পেতে এবং বড়দের কাছে গ্রহণীয় হতে চায়।
- শিশুরা অনুসন্ধিৎসু হয়। ফলে তারা নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে। নানা রকম কাজ, অভিজ্ঞতা ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করতে পছন্দ করে।
- শিশু নিজের মত করে পৃথিবীকে দেখে, বড়দের মত করে নয়। তারা কল্পনাপ্রবণ। শিশু কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা।
- শিশু নিজেকে হাতি, ঘোড়া, ভালুক, প্রভৃতি কল্পনা করে। খেলার ভিতর দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নানা রকম অভিজ্ঞতা যুক্ত করে।
- নানা রকম রূপকথার গল্প, ছেলে ভুলানোর ছড়া ইত্যাদি শুনতে খুবই ভালোবাসে। এগুলো শিশুর কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে।
- শিশু তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোঝার চেষ্টা করে। অন্যের কাজকে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে।
- বিশ্ব জগতের অধিকাংশ সামগ্রীকে সে জীবন্ত মনে করে; কারণ অন্যান্য প্রাণি ও বস্তুর মধ্যে সে নিজের মনের অনুভূতি ও আবেগ আরোপ করে।
- সাধারণত কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না।
- শিশুরা খেলতে পছন্দ করে। সাধারণতঃ শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলা শিশুর শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তা ছাড়া শিশুরা নানারকম কাজ করে শেখে।
- আত্মকেন্দ্রিক হয়। তার চিন্তা-ভাবনা নিজেকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।
- সহজে ভাষা আয়ত্ব করে।

- আমিত্ববোধের সৃষ্টি হয়।
- প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও সংস্কারের প্রতি সাধারণ বিশ্বাস ও আনুগত্যের সঞ্চার হয়।
- বয়ঃসন্ধিকালে অন্যের সঙ্গে নিজের মনোভাবের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যার ফলে মনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হয়।
- শিশুরা চঞ্চল ও প্রাণবন্ত। তাই ছুটাছুটি, লাফ-ঝাপ, দাপাদাপি অধিক পরিমাণে করে।
- শিশু তার স্বভাবসুলভ কারণেই চারপাশের পরিবেশকে আবিষ্কার করতে চায়। পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে এবং বন্ধু বান্ধবের দলে নেতৃত্ব দান করে। ফলে সে বহির্মূখী জীবনের স্বাদ পায়।
- শিশুরা আনন্দপ্রিয় হয়। তারা নানা আনন্দময় কাজ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে ও যুক্ত হতে পছন্দ করে।
- খেলা ও খেলনা বেশি পছন্দ করে। খেলাই শিশুর প্রধান কাজ এবং খেলার মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে।
- শিশুরা কৌতুহলী হয়। তার স্বভাবসুলভ কারণেই বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করে জানার ও বুঝার চেষ্টা করে।
- শিশুরা অনুকরণ প্রিয়। তারা তাদের চারপাশের বড়দের ও সঙ্গীদলের সদস্যদের অনুকরণ করে শিখে।

অংশ-খ	বয়সভেদে শিশুর বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় সব শিশুই প্রাকৃতিক নিয়মে একটি নির্দিষ্ট বয়সে বসে, দাঁড়ায়, হাঁটে, কথা বলে। খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে এক একটি দক্ষতা অর্জন করে। দক্ষতা অর্জনের সময়সীমাকে বিকাশের মাইলফলক বলে। যেমন- দেড় মাসে শিশু হাসি দিতে শেখে, ৬ মাসে সাহায্য নিয়ে এবং ৯ মাসে সাহায্য ছাড়া বসতে পারে, ৯-১০ মাসে হামাগুড়ি দেয়, ১২-১৪ মাসে হাঁটে, ২ বছরে ভালোভাবে/স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারে ইত্যাদি। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বৈশিষ্ট্য, শিখন এবং বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশুর জীবনচক্র বয়স অনুসারে বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি স্তরকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেরই রয়েছে কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা বয়সভেদে শিশুরা ঐ নির্দিষ্ট দক্ষতা বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। শিশুর জীবনের একেকটি স্তরের দক্ষতা ও বিকাশ পরবর্তী স্তরের শিক্ষা ও বিকাশের ভিত রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, কোনো একটা স্তরের বিকাশের ধারা কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হলে তা পরবর্তী স্তরের দক্ষতা ও বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। এভাবেই শিশুর জীবনে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটতে থাকে যা বয়সের সাথে সাথে পরিপূর্ণতা পায়। পূর্বের স্তর পার না করে সাধারণত শিশু পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন– কোনো শিশু হাঁটা না শিখে দৌড়াতে পারে না, বা বলা যায় হাঁটা ভালোভাবে না শিখে কেউ ভালোভাবে দাঁড়াতে পারে না। শিশুর জীবনের বিভিন্ন বয়ঃক্রমে তাদের বৈশিষ্ট্য, পছন্দ, চাহিদা ও প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। আবার, নির্দিষ্ট একটি বয়সে সকল শিশুর আচরণে বিশেষ কিছু সাধারণ

বৈশিষ্ট্য (মিল) দেখা যায়। এক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া, বিভিন্ন দেশের শিশুদের মধ্যে মোটামুটি একই ধারাক্রম অনুযায়ী বিকাশ ঘটে থাকে। সাধারণত একটি শিশু তার সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে না কি পিছিয়ে আছে তা বিকাশের মাইলফলক দেখে বুঝা যায়।

মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। সামগ্রিকভাবে জীবন বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বয়স ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। কিন্তু এই বিভাজনে বেশ মতবিরোধও রয়েছে। সাধারণত ভ্রুণাবস্থা থেকে প্রারম্ভিক শিশুকাল শুরু হয় তবে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শিশুকাল বা শৈশবকে কয়েকটি ছোটো ছোটো পর্বে ভাগ করা হয়; যেমন- প্রারম্ভিক শৈশব, শৈশব ও কৈশোর। যেহেতু আমরা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের সাথে কাজ করব, তাই প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালে শিশুর বিকাশ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

প্রারম্ভিক শৈশব (Early Childhood): পৃথিবীর প্রায় অনেক দেশেই প্রারম্ভিক শৈশব বলতে গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। বাংলাদেশে 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩' অনুযায়ী প্রারম্ভিক শৈশবকাল গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে মূলতঃ ভ্রুণাবস্থা থেকে ৫ বছর- জীবনব্যাপি শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি গঠনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬-৮ বৎসর- শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সহজ ও সাবলীল উত্তরণের সাথে সম্পৃক্ত।

এই সময়ে শিশু লম্বা ও ক্ষীণকায় হয়। হাঁটা, দৌড়ানো, খেলাধুলা করা, ধরা ইত্যাদিতে আরও বেশি দক্ষতা অর্জন করে। তারা নিজের কাজগুলো করতে পারে। যেমন- নিজে খাওয়া, পোশাক পরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। এছাড়া, তারা স্ত্রী পুরুষের বিদ্যমান পার্থক্য করতে শিখে। তারা পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে। সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করে। এ বয়সে তারা কৌতুহলী হয় ও অনেক প্রশ্ন করে।

শৈশবকাল (Middle Childhood): সাধারণত প্রাক-কৈশোর থেকে যৌবনাগমন (Adolescence) এর পূর্ব পর্যায়টিকে ধরা অর্থাৎ শিশুর ১১ বছর বয়স সীমাকে বুঝানো হয়।

এই সময় শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। বর্হিজগতের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ট হয়। এই বয়স হলো দল গঠন করার বয়স। লেখাপড়া ও গণনার মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে। তারা সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকতে আনন্দবোধ করে এবং ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। লিঙ্গ অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালন শিখে।

তথ্যসূত্র:

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

২. Retrieved from http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-05.pdf

৩. ‘শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন’ বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
৪. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

সহায়ক তথ্য-০২	অধিবেশন-০২: শিশুর চাহিদা ও অধিকার

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর চাহিদা এবং অধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর চাহিদা ও অধিকার

একটি শিশু যা কিছুর অভাববোধ করে বা তার যা কিছু পেতে ইচ্ছা জাগে, সেটাই তার চাহিদা। শিশু এই সময় সর্বদা তার পিতা-মাতার সাথে থাকতে চায়। কেননা তাদের কাছেই সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এটা তার নিরাপত্তার চাহিদা। শিশুর মাঝে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা দেখা যায়: জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা।

জৈবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে-খাদ্যের চাহিদা, ঘুমের চাহিদা, প্রাতঃকর্মের চাহিদা, ইত্যাদি।

মানসিক চাহিদার মধ্যে আছে-আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাহিদা, কল্পনার চাহিদা, ইগোকে পুষ্ট করার চাহিদা, বুদ্ধি বিকাশের চাহিদা, আত্মতৃপ্তির চাহিদা, জানার চাহিদা, আধিপত্যের চাহিদা, অনুকরণের চাহিদা ইত্যাদি।

সামাজিক চাহিদার মধ্যে আছে প্রশংসা পাওয়ার চাহিদা, সম্মানের চাহিদা, নেতৃত্বের চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা, অপরকে ভালোবাসার চাহিদা, স্বীকৃতির চাহিদা, খেলার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, পুনরাবৃত্তির চাহিদা, অস্তিত্বের চাহিদা, সাফল্যের চাহিদা, ক্ষমতার চাহিদা, অধিভুক্ত হওয়ার চাহিদা, কার্যসম্পাদনের চাহিদা, প্রতিক্রিয়ার চাহিদা, প্রার্থনা করার চাহিদা, অনুকরণের চাহিদা, জানার চাহিদা , দলবদ্ধ হওয়ার চাহিদা, সহযোগিতার চাহিদা ইত্যাদি।

শিশু তার চাহিদা পূরণে যদি তৃপ্ত না হয়, তখন অনেক সময় সে আক্রমণাত্মক আচরণ করে। এসব চাহিদাপূরণে অতৃপ্তিতে ভবিষ্যতে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হয়।

শিশু অধিকার:

শিশুদের অনেক কিছুর চাহিদা রয়েছে। বড়দের মতো তার রয়েছে শারীরিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, ভালোবাসা ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চাহিদা। তবে কিছু কিছু চাহিদা আছে যা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য, নিরাপদভাবে বসবাসের জন্য, সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশুর এ সকল আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। এ সকল প্রয়োজনীয় চাহিদাকে শিশুর অধিকার বলা হয়। শিশুর অধিকার হলো শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সব সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। শিশুর মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। শিশুর তিন ধরনের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে: আইনগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়/নাগরিক। শিশুর অধিকার সনদের মূলনীতি: বৈষম্যহীনতা, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ, বেঁচে থাকা ও বিকাশের নিশ্চয়তা, অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা।

শিশুর অধিকারগুলোকে বিবেচনায় রেখে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশু অধিকার সনদটি ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে পরিণত হয়। সমাজের সর্বস্তরে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের কথা

অংশ-খ	শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বিবেচনায় রেখে শিশুর অধিকারগুলোকে শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি ধারায় রাখা হয়েছে। এই ধারাগুলোকে মূলত পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

বেঁচে থাকার অধিকারঃ শিশুর মৌলিক অধিকারের মধ্যে যেসব চাহিদা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে বেঁচে থাকার অধিকার বলে। যেমন- সন্তোষজনক জীবনমান, নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, পুষ্টি, চিকিৎসা ইত্যাদির অধিকার।

সুরক্ষার অধিকারঃ নানা রকম বৈষম্য, অবহেলা, নিপীড়ন এবং হত্যার মতো জঘন্য অবস্থা থেকে শিশুদের রক্ষা পাওয়ার অধিকারসমূহ এই অধিকারগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে।

বিকাশের অধিকারঃ যে সমস্ত অধিকার শিশুর সার্বিকভাবে বেড়ে ওঠায় সহায়তা করে সে সমস্ত অধিকারসমূহ বিকাশের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- শিক্ষা, খেলাধুলা, বিশ্রাম, চিন্তা, বিবেক, তথ্য ও জ্ঞানলাভ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় কার্যক্রম পালনে স্বাধীনতা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

অংশগ্রহণের অধিকারঃ শিশুদের স্বাধীনভাবে কথা বলার, অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যোগদান এবং দলবদ্ধ হওয়ার অধিকার এই ভাগের মধ্যে রয়েছে।

সমাবেশীকরণের অধিকারঃ শিশুদের অধিকার আদায়ের জন্য সমাজের সবার সচেতনতা ও দায়িত্ব পালনে অংশ নেওয়া দরকার। তাই শিশুর পরিচিতি শনাক্তকরণসহ সমাজে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ, সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়নে অর্থ-সম্পদ যোগান ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা ও তথ্যসমূহ এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, শিশুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কোনো সরকারের একার নয়। এ দায়িত্ব শিশুদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত সকলের। তাই শিশুর অধিকার বাস্তবায়ন জন্য কী করতে হবে, কারা কারা করবেন, কীভাবে করবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে ধারাগুলো রয়েছে তা সমাবেশীকরণের অধিকার গুচ্ছে রয়েছে।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার সম্পর্কিত সংসদীয় ***ককাস** (Caucus) রয়েছে। এটি হলো নির্দলীয়, সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি যা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত শিশু অধিকার রক্ষা ও শিশু সুরক্ষার জন্য কাজ করে।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের চাহিদা:

- জন্মের পরই শিশু দ্রুত শিখতে শুরু করে। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বড়দের ভালোবাসা ও মনোযোগ।
- শিশুর বিকাশে শিশুর জন্য খেলাধুলা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।
- মা, বাবাসহ পরিবারের অন্যন্য সদস্য ও স্কুলের শিক্ষক শিশুর খেলায় সাহায্য করতে পারে।
- শিশু অল্পেই জেদ করে, ভয় পায়, সুতরাং খুব ধৈর্য ও সহানুভূতি নিয়ে তার আবেগ অনুভূতির প্রতি সাড়া দিলে সে সুস্থ মন ও মানসিক ভারসাম্য নিয়ে বড় হয়ে ওঠে।
- শিশু ঘন ঘন বড়দের কাছ থেকে উৎসাহ ও সম্মতি পেতে চায়।
- যেকোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি তার বিকাশের অন্তরায়।
- শিশু বড়দের অনুকরণ করে, সুতরাং বড়রা এমন কোন আচরণ তার সাথে করবেন না যাতে সে খারাপ আচরণটি দেখে নিজের মাঝে আত্মস্থ করে নেয়।
- শিশুর বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক মা-বাবা ও শিক্ষক।

- শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই তার স্কুল জীবনের সুশিক্ষার ভিত তৈরি হয়। সুতরাং এ বিষয়টিতে নজর রেখে তার বিকাশের ভিত্তি তৈরি করতে হবে।
- শিশুর চাহিদাগুলো তার বিকাশের সহায়ক, এই সহায়তা মা-বাবাই দেবেন।

প্রতিবন্ধকতা	নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ
১. বেঁচে থাকায় ২. সুরক্ষায় ৩. বিকাশগত ৪. অংশগ্রহণ ও সমাবেশীকরণে বাঁধা ৫. পুষ্টিজনিত ৬. আর্থ-সামাজিক ৭. পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত অবস্থা ৮. ঋতুভেদগত তারতম্য ৯. ক্রনিক ব্যাধি ১০. আবেগীয় ট্রমা ১১. লিঙ্গ ভিন্নতা ১২. পরিবারে শিশুর অবস্থান ১৩. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগত প্রভাব ১৪. সংস্কৃতি ১৫. মানসিক প্রভাব সম্পর্কিত উপাদান ১৬. সামাজিকীকরণ সংশ্লিষ্ট উপাদান	• সমাজ সচেতন নয়, শিশুদের পরিবার সচেতন নয়, পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা, শিশু শ্রম, নির্যাতন, যথাযথ পুষ্টিকর খাবারের অভাব, শারীরিক সমস্যা, ইত্যাদি। • যাদের দ্বারা শিশুরা সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার কথা, তাদের হাতেই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতিনিয়ত সহিংসতা, ভৎসনা এবং শোষণের শিকার হয়। প্রতি ১০ জনের মধ্যে নয়জন শিশুই তাদের বাবা-মা এবং শিক্ষকসহ সেবাদানকারীদের দ্বারা শারীরিক শাস্তি বা মানসিক আগ্রাসনের শিকার হয়। • বাংলাদেশে অনেক শিশুই সময়ের আগেই বড় হয়ে যেতে বাধ্য হয়। নিজেদের পরিবারের বেঁচে থাকার কৌশলের অংশ হিসেবে অনেক কিশোর-কিশোরীকে প্রায়ই কাজে পাঠানো হয় বা তাদের অপরিণত বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী প্রায় সাত শতাংশ শিশু কোনো না কোনো ধরনের শিশুশ্রমে জড়িত। এয়াড়াও খুব অল্পবয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা অব্যাহত রয়েছে। • বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। ২২ থেকে ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি নারীর অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যকের (৫১ শতাংশ) তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। • বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সুস্থতার জন্য গুরুতর সমস্যা এবং এটি তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজীবন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেসব মেয়েদের বাল্যকালে বিয়ে হয়, তাদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। তারা অপুষ্টিতে ভোগে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন জটিলতার কারণে অনেকেই অশালে মারা যায় এবং পরিণত বয়সে বিয়ে করা মেয়েদের তুলনায় বাড়িতেও তাদের বেশি সহিংসতার সম্মুখিন হতে হয়। • লাখ লাখ শিশুর মাথার ওপর ছাদ নেই। তারা রাস্তায় বসবাস করে ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিশুদের আরেকটি অংশ প্রতিবন্ধীত্বের শিকার। এসব শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বৈষম্য,

	সামাজিক কলঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়। ● শিশু অধিকারের সংগ্রাম জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫৬ শতাংশ জন্মের সময় নিবন্ধিত হয়। এর অর্থ লক্ষ লক্ষ শিশু একটি পরিচয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ন্যায়বিচার পাওয়া তাদের আরেকটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে ১০২টি শিশু আদালত থাকা সত্ত্বেও কিশোর-কিশোরীদের জন্য যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ২৩ হাজারেরও বেশি মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণঃ

- শ্রেণিকক্ষে উচ্চ মেধা, স্বল্প মেধা ও নিম্ন মেধা বা পিছিয়ে পড়া এ তিনধরনের শিক্ষার্থী থাকে। এরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে। কেউ ধনী কেউ আবার গরীব। তাদের বাসা বা বাড়ির পরিবেশও বিভিন্ন। তাই এদের অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিখনে এগিয়ে আসতে পারে না। কারণ বাসায় বা বাড়িতে পড়ার পরিবেশ ইতিবাচক নয়। পরিবারের পরিবেশগত চাহিদার অভাবে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- আবার কখনো কখনো দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতা, উদাসীনতার কারণে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ছে। সহযোগিতার চাহিদার অভাবেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না বলে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- কোনো কোনো শিক্ষার্থীর ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি আছে বলে তারা সব সময় পেছনের বেঞ্চে বসে এবং এদের মধ্যে শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে।
- বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতম শিক্ষকের অভাবও শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ।
- নিরক্ষর পরিবারে বেড়ে উঠা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উদাসীনতা তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম আরেকটি কারণ।
- শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকা। শ্রেণিকার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাঠের সাথে পরিচিত হতে পারে না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর না নেওয়ার কারণেও তারা বিদ্যালয় বিমূখ হয়।
- বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারও শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।
- অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা ও নানারকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে।
- আবার দেখা যায়, কোনো পরিবার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ফলে সেই পরিবারের সন্তানেরা সাধারণভাবেই শিক্ষা বিমুখ হয়ে পড়ে। দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষক শ্রেণিতে অমনোযোগী থাকেন। আবার সব শিক্ষক যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন না। তাই অনেক শিক্ষার্থী

এ সুযোগের নেতিবাচক সদ্ব্যবহার করে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমেই শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে।

- বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া এবং অবস্থানের কারণে শিক্ষার্থী মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যা তাকে বিদ্যালয় বিমূখ করে তোলে।
- এয়াড়া শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থাকলেও শিক্ষার্থী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে অনগ্রসর বা সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়।

অংশ-গ	**শিশুর চাহিদা ও অধিকার পূরণে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে শিক্ষকের করণীয়**

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের উপায়ঃ

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিরূপিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য শিক্ষক অভিভাবক উভয়কে সচেতন হতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ধরে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে নিরাময়মূলক ক্লাশ নেওয়ার মাধ্যমে। যেমন- যে বিষয়গুলোতে দুর্বল সে বিষয়গুলো বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে এক থেকে দুই ঘণ্টা অনুশীলন, ক্লাশ চলাকালীন অনুশীলন, ক্লাশ শেষে অনুশীলন এবং একই বিষয়বস্তুর ওপর বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে কাজ প্রদানের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী হওয়া সম্ভব।
- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে।
- পড়ার সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে সন্ধ্যা থেকে রাতে কয়টা পর্যন্ত কোন কোন বিষয় পড়বে। কোন বিষয় লিখবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সন্ধ্যা থেকে অন্তত রাত দশটা পর্যন্ত বাসায় যাতে টেলিভিশন না চলে। এতে একাগ্রচিত্তে শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকমের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে সে নিজেকে পড়া লেখায় আগ্রহী করবে এবং বিষয়বস্তুর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সমস্যার কথা অভিভাবক ও শিক্ষককে আন্তরিকতার সাথে শুনতে হবে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হবে।
- অবশ্যই অভিভাবককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।
- প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন না থাকলে শিক্ষার্থীর হাতে মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি না দিলে শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট হবে না। লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।
- বিদ্যালয় প্রশাসন যদি যত্নবান থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্ণয় করে সেভাবে তাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীও অগ্রসর হতে পারে।

- শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে সময় ব্যবস্থাপনা।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

শিক্ষকের করণীয়ঃ

- শিশুর চাহিদা অনুযায়ী গল্প বলা, বই পড়া, খেলাধুলা করা, আবৃত্তি করা ইত্যাদি।
- সকল শিক্ষার্থীকে সবক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষক এমন প্রশ্ন করবেন যাতে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কথার প্রাধান্য দিবেন এবং প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাজ থেকে উত্তর নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভাবার সুযোগ দিবেন।
- সকল শিক্ষার্থীদের কথা বলার/প্রশ্ন করার সুযোগ দিবেন।
- শিখন-শেখানোর কাজে চাহিদার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো আসবাবপত্র পুনঃসজ্জিত করবেন (যেমন জোড়ায় অথবা দলীয় কাজ, ভূমিকাভিনয় অথবা আলোচনার ক্ষেত্রে)।
- শিক্ষার্থীদের সাথে হেসে কথা বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাথে সকল বিষয় খোলামেলা আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভালো কাজ এবং আচরণের জন্য প্রশংসা করবেন।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন চাহিদা সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ শ্রেণিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের তাদের ভাল কাজ এবং আচরণের জন্য প্রশংসা করবেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। পেশাগত শিক্ষা, (প্রথম খন্ড), ডিসেম্বর ২০১৯, ডিপিএড তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ।
২। http://breakingthesilencebd.org/childrenneed.html
৩। https://www.unicef.org/bangladesh
৪। http://scouts.portal.gov.bd/sites/default/files/files/scouts.portal.gov.bd।
৫। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1119.html

***ককাস**: (ইং- Caucus) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বহুল ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ যার অর্থ হলো কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা চক্র যেটি বিশেষ একটি বিষয়ে নীতিনির্ধারণী কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত। আদিতে কেবল নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ককাস গঠন করা হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বহুদলীয় ককাস আছে যারা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নীতিনির্ধারণী কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে)

সহায়ক তথ্য-৩	শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ কী কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ. শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। শিশুর পরিবর্তন প্রধানত দুইভাবে ঘটে। দৈহিক আকার আকৃতিতে শিশুর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে শিশুর বৃদ্ধি বলে। এই বৃদ্ধি বলতে বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ও আকারে বড় হওয়াকে বোঝায় যা পরিমানগত। মানব জীবনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি সাধিত হয়।

অপরদিকে আচরণ, দক্ষতা, কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতাতে শিশুর যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে তাকে শিশুর বিকাশ বলে। এই বিকাশ বলতে শিশুর শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ- এই চারটি ক্ষেত্রের বিকাশকে বোঝায়। তবে আকার আকৃতির মতো শিশুর বিকাশ সরাসরি দেখা যায় না, শিশুর পারা ও না পারার দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে এই পরিবর্তন বুঝা যায়। বিকাশ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং তা জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে পারে। ব্যক্তির ও সামাজিক অভিযোজনের সাথে বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত নয় কিন্তু বিকাশ ব্যাহত হলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিযোজন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর সার্বিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য বিকাশ ও বৃদ্ধি অপরিহার্য।

চিত্রঃ শিশুর পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

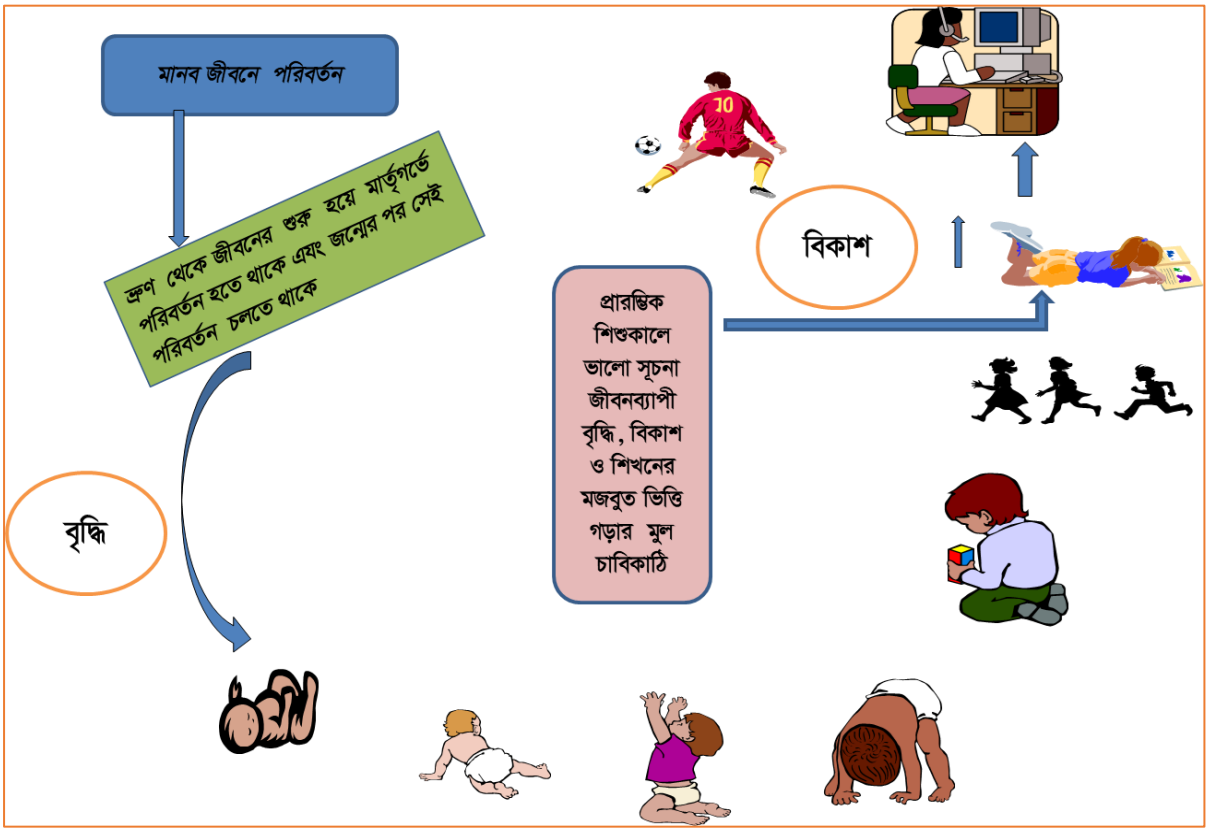

অংশ-খ	শিশুর বিকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও প্রারম্ভিক শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানদণ্ড নিরূপণ করার জন্য 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০' (Early Learning and Development Standards-ELDS, 2020) প্রণয়ন করেছে। ELDS এ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বয়সভিত্তিক আচরণ ও কাজ করার ক্ষমতার ক্রমবিকাশকে নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে।

শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতার বিকাশ (Physical and Motor Development)ঃ শারীরিক বিকাশ হলো শিশুর শারীরিক দক্ষতা ও সক্ষমতা যা শিশুর সুস্থ বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করে এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। যেমন- দৌড়ানো, লাফঝাপ ও ছুটাছুটি করে খেলার সময় শিশুর শারীরিক বিকাশ ঘটে থাকে।

সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ (Social and Emotional Development)ঃ সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ হচ্ছে শিশুর ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া (Positive Interaction) এবং ছোট-বড়দের ও সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখার জন্য শিশুর যোগ্যতা। যেমন- সমবয়সী ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে

থাকা, খেলাধুলা করা এবং সামাজিক রীতি-নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ (Language and Communication Development): ভাষার নিয়মকানুন বোঝার ও যোগাযোগের জন্য নিয়মকানুনগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহারের সক্ষমতা এবং শব্দ উচ্চারণ, পড়া ও লেখা ইত্যাদির দক্ষতা হচ্ছে ভাষা ও যোগাযোগমূলক বিকাশ। যেমন- শিশুর সাথে গান, গল্প ও ছড়া বলা ও শোনার মাধ্যমে শিশুর ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতার বিকাশ ঘটে থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ (Cognitive Development): সামাজিক ও ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান ও ধারণা এবং তাদের চিন্তা, গাণিতিক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও যুক্তি দেখানোর সক্ষমতা হচ্ছে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। যেমন- ছবি দেখে ও মিলিয়ে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া, সংখ্যা চেনা ও ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করার মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে।

অংশ-গ	শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের গুরুত্ব

শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকাল: মানবজীবনের বিকাশ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। সামগ্রিকভাবে জীবন বিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বয়স ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তবে এই বিভাজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতও রয়েছে। সাধারণত ভ্রূণাবস্থা থেকে প্রারম্ভিক শিশুকাল শুরু হয় তবে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শিশুকাল বা শৈশবকে কয়েকটি ছোট ছোট পর্বে ভাগ করা হয়; যেমন- প্রারম্ভিক শৈশব, শৈশব ও কৈশোর।

প্রারম্ভিক শৈশব: পৃথিবীর প্রায় অনেক দেশেই প্রারম্ভিক শৈশব বলতে গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। বাংলাদেশে 'শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩' অনুযায়ী প্রারম্ভিক শৈশবকাল গর্ভ থেকে শিশুর আট বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। এই সময়ের মধ্যে মূলতঃ ভ্রূণাবস্থা থেকে ৫ বছর জীবনব্যাপী শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তি গঠনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ৬-৮ বছর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের ভিত্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় সহজ ও সাবলীল উত্তরণের সাথে সম্পৃক্ত।

শৈশবকাল: সাধারণত প্রাক-কৈশোর থেকে যৌবনাগমন (Adolescence) এর পূর্ব পর্যায়টিকে ধরা অর্থাৎ শিশুর ১১ বছর বয়স সীমাকে বুঝানো হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালের বিকাশের গুরুত্ব: মানবজীবনের মূল ভিত্তি গঠিত হয় প্রারম্ভিক শৈশবে। এ সময়কালে শারীরিক ও পেশি সঞ্চালন, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ বিকাশের মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। যেমন-

- প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন, বিকাশ, মস্তিষ্কের কোষসমূহের সংযোগসাধনের মাধ্যমে শিশুর সুস্থতা ও সার্বিক বিকাশের অধিকাংশ ঘটে যা শিশুর বিকাশে দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং এই বয়সের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন সহকারে লালন-পালন করলে শিশুর মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করার জন্য বিকশিত হবে। আর প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন না পেলে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় যা পরবর্তীকালে পুরণ করা সম্ভব হয় না।

- উদাহরণ দিয়ে এভাবে বলা যেতে পারে যে, একটি বাড়ি তৈরির সময় ভিত্তি যদি মজবুত না হয় তবে বাড়িটি টেকসই হবে না অর্থাৎ বাড়ির পিলার/ভিত বা ইট সরিয়ে নেওয়া হলে বাড়িটি ভেঙে পড়বে। ঠিক তেমনভাবেই শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবের ভিত যদি শক্ত না হয় তাহলে তার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে এবং পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। পরিপূর্ণ বিকশিত শিশুর জন্য চাই শুরুতেই সঠিক আদর-যত্ন। প্রারম্ভিক শৈশবে সঠিক আদর-যত্ন পেলে শিশু পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত হবে ।

সুতরাং মানবজীবনের ভিত্তি গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবের বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্রঃ

১. ‘শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন’ বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

২. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের আদর্শিক মান (২০২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ইউনিসেফ

3. Retrieved from- http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-05.pdf

সহায়ক তথ্য - ০৪ শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বয়সভেদে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বয়সভেদে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের সূচকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ

মানব জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভে। তাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতিতে (ECCD policy 2013) গর্ভাবস্থা থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশবকাল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ৮ বছরের মধ্যে গর্ভ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সার্বিক বিকাশের ভিত্তি গড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর প্রবেশ ও উত্তরণের যাত্রাপথকে মসৃণ করার (Smooth transition to primary school) জন্য ৬ থেকে ৮ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ন সময়, তাই গর্ভ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত সময়ে শিশুর যে বিকাশ ঘটে তাই তার প্রারম্ভিক বিকাশ।

শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরত্ব

প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশু যদি যথাযথ পারস্পরিক ক্রিয়া, যত্ন ও উদ্দীপনা না পায় তাহলে পরবর্তী সময়ে চেষ্টা করেও তার মধ্যে সার্বিক বিকাশ সম্পর্কিত গুণাবলি/ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করা সম্ভব নয়। এজন্য এ সময়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা হয়।

শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান:

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ তার বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত এবং একটি অপরটির পরিপূরক। তবে শারীরিক বৃদ্ধি নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত ঘটলেও শিশুর বিকাশ একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া। শিশুর এই বিকাশের মাত্রা ও ধরন বংশগত বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও শিক্ষা ইত্যাদির কারণে শিশুভেদে ভিন্ন হলেও সকল শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশর মধ্যে প্রাকৃতিক ও বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে। বিকাশের সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকশিত হয়ে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা যেমন একটি শিশুর অধিকার, তেমনি তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রত্যেকটি দেশের দায়িত্ব।

যদিও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রমাণ থেকে স্বীকৃত যে শিশুরা অনবরত শিখে চলে কিন্তু কম বয়সের শিশুদের এই শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য টুল (tool) অভাব রয়েছে। এজন্য বৈশ্বিক পর্যায়ে জন্ম থেকে ৮ বছর পর্যন্ত কম বয়সী শিশুদের বিকাশ এবং শিখন সম্পর্কে জানা এবং সকল দেশের শিশুরা যেন একটি ন্যূনতম পর্যায় পর্যন্ত বিকশিত হয় তার জন্য 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান (Early Learning and Development Standard – ELDS) ' তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাকে অনুমোদন করে এবং

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'কম বয়সের শিশুদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কী শেখা এবং কী করতে পারা উচিত' সে সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করে একটি সাধারণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে।

প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিত মান (ELDS) নির্ধারণের জন্য শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রকে ৪টি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা হয়েছে। গর্ভধারণ থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অবিরাম শিখন এবং বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবনচক্র পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে শ্রেণি বিভাজন করা হয়েছে। এই বয়সকালের শিশুদের মধ্যেও ব্যক্তিগত তারতম্য থাকে এবং এই বয়স প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়সের সাথে মিলে যায় বলে নিচের বয়স-সীমা অনুযায়ী ELDS সাজানো হয়েছে।

জন্ম-১২ মাস (< ১ বছর)
১৩-৩৬ মাস (১ থেকে ৩ বছর)
৩৭-৪৮ মাস (৩ থেকে ৪ বছর)
৪৯-৬০ মাস (৪ থেকে ৫ বছর)
৬১-৭২ মাস (৫ থেকে ৬ বছর)
৭৩-৯৬ মাস (৬ থেকে ৮ বছর)

সকল শিশুই বিকাশের একই ধরণের ধাপ অতিক্রম করে, তবে তা নিজস্ব রীতি ও গতিতে। দরিদ্র পরিবার, সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, সংখ্যালঘু জাতিসত্তা এবং দুর্গম ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুসহ সকল শিশুর জন্য এই আদর্শিক মান সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে সাধারণত শিশুদের প্রাথমিক শেখা ও উন্নয়নের মানদন্ড বোঝাতে শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ব্যবহৃত হয়। এটি একটি গাইডলাইন বা কাঠামো যা শিশুদের মানসিক, সামাজিক, শারীরিক এবং জ্ঞানীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

অংশ-খ	শিশুর বিকাশের সূচক

একটি শিশুর দক্ষতাগুলোকে 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০' অনুযায়ী বিকাশের চারটি ক্ষত্রে ভাগ করা হয়েছে। শিশুর বয়সভিত্তিক আচরণ ও কাজ করার ক্ষমতার ক্রমবিকাশকে যে প্রধান চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে তা হলো- **শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ**।

শিশুর জন্য সূচক	শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা	সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ	ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ	বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ
(৪৯ মাস - ৬০ মাস)	-ক্লান্তি ছাড়াই সক্রিয়ভাবে খেলাধুলা, বাইরের খেলায় এবং অন্যান্য অনুশীলনে সহজেই একনাগাড়ে	-কোন কিছু অনুসরণ করার পূর্বে নিয়ম ও রুটিন সুস্পষ্ট করে নেয় -যত্নকারী ছাড়াও	-কিছু কঠিন/জটিল শব্দসহ জানা শব্দের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। -শুনে শুনে তথ্য	-নিজের বাড়ি বা অন্যান্য পরিচিত জায়গায় প্রাকৃতিক সচেতনতা প্রকাশ করে (যেমন- ঘরের পাশে ময়লা থাকলে

	৪৫ মিনিট পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। -৫ মিনিটের মত তালে তালে কুচকাওয়াজ করতে পারে -ছবি আঁকার ও শিল্পকর্ম বিভিন্ন উপকরণ (পেন্সিল, রঙ খড়ি, তুলি, পাতা, দানা, কয়লা ইত্যাদি) ব্যবহার করে ছবি আঁকে।	বিশেষভাবে পরিচিত/গুরুত্বপূর্ণ বড়দের (যেমন- শিক্ষক) সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক অনুভূতি প্রকাশ করে । -সক্রিয়ভাবে শ্রেণিকক্ষ এবং গ্রুপ রুটিনের কাজে অংশগ্রহণ করে এবং অন্য শিশুদের সাথে খেলা করে কিন্তু তার নিজের মত করে খেলে । -নিয়ম অনুসরণ করে এবং যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তার ফলাফল মেনে নেয়।	আত্মস্থ করতে পারে । -প্রাসঙ্গিক / সুনির্দিষ্ট (preposition) শব্দ ব্যবহার করে দেয়া তিন ধাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা (যেমন- ভেতরে, উপরে, নীচে) -সহজ ছোট ছোট গল্প বুঝতে পারে ও এগুলোর বিষয়ে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে।	মশা হবে) -প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণে সক্রিয় অংশ নেয় (যেমন- বৃষ্টি আসলে জানালা বন্ধ করে দেয়, বাইরে থেকে শুকনা কাপড় ঘরে নিয়ে আসে)
শিশুর জন্য সূচক (৬১ মাস - ৭২ মাস)	-দীর্ঘকালীন নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ডে (যেমন- হাঁটা, নাচা, আনুষ্ঠানিক খেলাধুলা ও অনানুষ্ঠানিক অনুশীলন) অংশগ্রহণ করতে পারে। -গতি নিয়ন্ত্রণ করে বলে লাথি মারে। -প্লে-গ্রুপ, প্রি-স্কুল ও স্কুলে নিরাপত্তা নিয়ম নীতি মেনে চলে ।	-কোন প্রকার ইশারা ইঙ্গিত ছাড়াই সঠিকভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে। -দুই বা ততোধিক সমবয়সী শিশুর সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে। -পরিবেশের সামাজিক ইঙ্গিতের প্রতি যথাযথ অভিব্যক্তি দেখায় (যেমন- কখন চুপ থাকতে হবে অথবা শ্রেণিকক্ষ, হাসপাতাল, ধর্মীয় স্থান এবং অন্যান্য সামাজিক সমাবেশে	-কোন বিষয়ের ওপর কথা বলে ও বোঝে। -দলীয় আলোচনায় অন্যদের কথা শোনে সঠিকভাবে সাড়া দেয়। -অন্যান্য শিশুদের সাথে অথবা বড়দের সাথে কথোপকথন শুরু করে ও তাতে অংশগ্রহণ করে। -আত্মবিশ্বাসের সাথে গল্প বলতে পারে ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প তৈরি	-প্রাকৃতিক বিভিন্ন জিনিসের নাম বলতে পারে (যেমন- নদী, খাল, বিল, পাহাড়) -প্রাকৃতিক ঘটনায় আগ্রহ প্রকাশ করে (যেমন- বন্যা, খরা, ঝড়) -পশুপাখি কিভাবে খায়, ঘুমায়, একসাথে থাকে এগুলো জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

		কখন কথা বলতে হবে তা বুঝতে পারে)	করতে পারে।	
শিশুর জন্য সূচক (৭৩ মাস ৯৬ মাস)	-নিজের পোশাক/জামায় বোতাম লাগাতে পারে -ছুড়ে দেয়া বল ধরতে পারে। -সুতা লাগানো, আঠা লাগানো এবং কাঁচি দিয়ে কাটতে পারে।	-প্রয়োজনে পাশে থেকে বন্ধুদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে -কোন সমস্যা সমাধানে অথবা কোন খেলা উন্নয়নে দেখায় । -একসাথে খেলতে গেলে কোন খেলার সাথির পরামর্শ অনুসরণ করে এবং কোন প্রস্তাব দেয়।	-সমার্থক শব্দ যেমন- অল্প: কম) ও কিছু কিছু বিপরীত শব্দ, যেমন- লম্বা: খাটো) বুঝতে পারে । -২০ মিনিটের বেশি সময় বইয়ে/বই পড়ায় মনোযোগী থাকতে পারে । -ছড়া ও কবিতা শোনা উপভোগ করে ও বুঝতে পারে । -যুক্তবর্ণ আছে এমন শব্দ পড়তে পারে।	-সঠিকভাবে মিলকরণ করতে পারে (যেমন- বোতলের সাথে তার মুখ, বয়ামের সাথে তার ঢাকনা) -নিজের বিন্যস্ত জিনিসগুলো কেন এবং কিভাবে সাজিয়েছে তা বর্ণনা করতে পারে। - কোনটির পর কোনটি আসবে তা বলতে পারে (যেমন- লাল-নীল, লাল-নীল)

অংশ-গ	**শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকের করণীয়**

শিক্ষকের করণীয়	**শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা**	**সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ**	**ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ**	**বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ**
(৪৯ মাস - ৬০ মাস)	-শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য খাবার ও পানির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলুন -জাংক ফুড/বাজে খাবার পরিহার করুন এবং এগুলোর কুফল সম্পর্কে শিশুকে বুঝিয়ে বলুন। -শারীরিক কার্যকলাপ (যেমন- নাচা, বল দিয়ে	-শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করুন, অন্যদের সাথে সম্পর্ক, দৈনন্দিন কার্যাবলি এবং শিশুর অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন।	-শিশুকে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলুন, আশেপাশের নতুন নতুন বস্তু, পশুপাখি ও মানুষের বর্ণনা দিন এবং তারা কি করছে তা বলুন । -শিশুদের জন্য	-পরিচিত এবং বিভিন্ন পরিবেশে পাওয়া যায় এমন গাছপালা ও পশুপাখি নাড়াচাড়া করার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন জীবের যত্ন নেয়া শেখাতে হবে

	খেলা, হাঁটা, লুকোচুরি খেলা,দৌড়ানো ইত্যাদিতে) করার জন্য উৎসাহ দিন। -কাজকর্মের মাঝে যথা সম্ভব বেশি করে তার জানা অক্ষর এবং সংখ্যা লেখার জন্য শিশুকে উৎসাহ দিন । -হাত দিয়ে বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম বানাতে, পানি ও কাদা দিয়ে খেলতে শিশুকে উৎসাহিত করুন। -শিশুকে ছবি আঁকার, রঙ করার ও কাঁচি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আকার/আকৃতি কাটার সরঞ্জাম দিন এবং ব্যবহার করতে উৎসাহ দিন।	-খেলায় পালা বদল ও কার্যক্রম নিয়ে কথা বলুন -শিশুকে বন্ধু তৈরি করতে উৎসাহিত করুন। -প্রান্তিক শিশুদেরকে (যেমন- দরিদ্রতার কারণে সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং জেন্ডার) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিন। -ছেলে ও মেয়ে শিশুর প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করুন। -একটি কাজ সম্পন্ন করতে অনেক লোকের প্রয়োজন আর এজন্য সকলের অবদান গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা/ব্যাখ্যা করুন । -শিশুদেরকে প্রশ্ন করতে দিন এবং ধৈর্য্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা সহকারে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিন।	আকর্ষণীয় বিষয়ের ওপর দলগত আলোচনা করার সুযোগ করে দিন (যেমন- শিশুর সাথে একসাথে গাছের পাতা সংগ্রহ করা ও পাতাগুলোর রঙ, আকৃতি ও নকশা সম্পর্কে আলোচনা করা) । -শিশুদেরকে তাদের দৈনন্দিন কাজ ও অভিজ্ঞতার কথা বলতে উৎসাহ দিন, প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের ভাষার দক্ষতা সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন । -শিশুদের গল্প বলা এবং তাদের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দিন। -প্রতিদিনের আলাপচারিতায় জটিল কঠিন ও নতুন শব্দ ব্যবহার করুন ।	(যেমন- বাড়ির বা টবের গাছপালা, পোষা প্রাণী ইত্যাদি) । -জীব কিভাবে বেঁচে থাকে, বড় হয়, পরিবর্তিত হয় এবং মারা যায় এসব বিষয় ভাবতে দিতে হবে। জীবের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংক্রান্ত গল্প পড়ে শোনাতে হবে। -চিড়িয়াখানা, পশুর খামার, পাখির খামার, মাছের খামার, নার্সারি বা বিভিন্ন সবজি বাগান পরিদর্শন করিয়ে বিভিন্ন জীব সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। পরিবর্তন হয় এমন প্রাণীর ছবি আঁকতে বা এই বিষয়ে গল্প বলতে দিতে হবে।

৬১ মাস - ৭২ মাস বয়সী শিশুর জন্য	-বল খেলায় নিয়োজিত করুন। -জন্তুদের চলাফেরা, চরিত্র অনুকরণ করতে এবং শরীরে বিভিন্ন ভঙ্গির (যেমন- দুইজন শিশু তাদের শরীরের সাহায্যে বৃত্ত, ব্রীজ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি বানাবে) এবং আঙুল দিয়ে আকার তৈরি করতে উৎসাহ দিন -বিপদে কার কাছে যাওয়া যাবে শিশু যেন জানে তা নিশ্চিত করুন	-শিশুদেরকে নানাবিধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বড়দের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে সহায়তা করা এবং যোগাযোগ ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন (যেমন- তথ্য চাওয়া, কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া) -শিশুরা যখন কথা বলে তখন তাদের কথায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে তাদের নিকট যোগাযোগের সঠিক মডেল/নিয়ম তুলে ধরুন। -শিশুদের অনুভূতি নিয়ে তাদের সাথে কথা বলুন, অনুভূতিকে সমর্থন/স্বীকৃতি দিন এবং তাদের সাথে অর্থপূর্ণ কথোপকথনে নিয়োজিত হোন ।	-গল্প পড়ার বা শোনার সুযোগ তৈরি করে দিন। -শিশুদের হাতে-কলমে শিখনের ব্যবস্থা করুন (যেমন- বোঝার জন্য উপকরণ ব্যবহার করা) -শিশুরা যা বলে তা আরো কঠিন/জটিল শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন। -কাজ ও অবস্থার ফাঁকে গান, ছড়া, ধাঁধাঁ শোনার সুযোগ করে দিন -শিশুদের পছন্দের বিষয়ে আলোচনা করুন।	-আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝতে পারা, রেকর্ড করা, বর্ণনা করা ও শনাক্ত করার জন্য শিশুর প্রয়াসে সহায়তা করতে হবে। -প্রতিদিনের পরিবেশে পাওয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে শিশুর খেলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে (যেমন- মাটি খুঁড়তে দেয়া) । -ঋতুর সাথে মানুষের আচরণ ও খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক বোঝাতে হবে (যেমন- ঋতুভেদে বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির একটি তালিকা বানানো)
৭৩ মাস ৯৬ মাস বয়সী শিশুর জন্য	-সমবয়সীদের সাথে স্কুলে ও মাঠে দলবদ্ধ খেলায় (যেমন- হা-ডু-ডু, দারিচা/দাড়িয়াবান্ধা, ছিবুড়ি, এক্কা দোক্কা এবং অন্যান্য স্থানীয় সক্রিয়মূলক খেলা) অংশ নিতে সুযোগ করে দিন ও খেলতে উৎসাহিত করুন	-শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করুন, অন্যদের সাথে সম্পর্ক, দৈনন্দিন কার্যাবলি এবং শিশুর অভিজ্ঞতায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা	-অভিনয়/অঙ্গভঙ্গির সাথে শিশুদেরকে ছড়া ও কবিতা পড়ে শোনান ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শিশুদেরকে তা পুনরাবৃত্তি করতে বলুন।	-বিভিন্ন বস্তুর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অর্থাৎ কেন হয় তা ব্যাখ্যা করতে হবে এবং শিশুকে সাথে নিয়ে হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে (যেমন- পানির

	। -শিশুকে বহিরাঙ্গনের খেলনা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে খেলা সংঘটিত করতে নিয়োজিত করুন।	করুন। -ধৈর্য্য ও সততার সাথে শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিন। -ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও অবস্থানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ থাকা গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করা ও মডেল হিসেবে দেখান ।	-শিশুদেরকে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করার, মতামত প্রকাশের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিন।	বরফ হওয়া) -জীবের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন নিয়ে গল্প পড়ে শোনাতে হবে। -পরিবর্তন হয় এমন প্রাণীর ছবি আঁকতে বা এই বিষয়ে গল্প বলতে দিতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান, (২০২০), বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

সহায়ক তথ্য-০৫	শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা ও প্রতিবন্ধকতা

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর বিকাশের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জেনে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

শিশুর বিকাশে তার পরিবারের পাশাপাশি তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু কোন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, তার সাথে তার শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন, তার খেলার সাথীদের সাথে সে কী খেলে, কীভাবে মেশে, তার বাবা-মায়ের সাথে তার শিক্ষকদের কেমন সম্পর্ক এরকম বিভিন্ন বিষয় শিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এমন কি বড় হবার পর তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে কীরকম আচরণ করবে, কী সিদ্ধান্ত নিবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিবার এবং পরিবেশের এই সমস্ত উপাদান শিশুর উপর কীভাবে এবং কতখানি প্রভাব ফেলে তার উপর। শিশুর আচরণ এবং তার প্রয়োজনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাই তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ান-আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ইউরি ব্রনফেনব্রেনার (Urie Bronfenbrenner) পরিবেশের এই সামগ্রিক প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যা বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব (Ecological System Theory) নামে পরিচিত। ব্রনফেনব্রেনারের এই তত্ত্বমতে শিশুর উপর তার এই পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব প্রধানত চারটি স্তরে কাজ করে। পরবর্তী অংশে এই চারটি স্তর আলোচনা করা হলো।

মাইক্রো সিস্টেমঃ এই স্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে শিশু। শিশু তার দৈনন্দিন জীবনে যাদের কিংবা যে সকল প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সংস্পর্শে আসে সেই সমস্ত মানুষ বা প্রতিষ্ঠান তার এই মাইক্রো সিস্টেমের উপাদান। মা-বাবা, ভাই-বোন, খেলার সাথী, বিদ্যালয়, শিক্ষক, ডেকেয়ার সেন্টার ইত্যাদি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। শিশুর আচরণ এবং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষে শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করেন, তবে পড়াশোনার প্রতি শিশুর একটি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে। তেমনি বাবা-মায়ের সাথে শিশুর সুসম্পর্ক তাকে পরবর্তীতে দায়িত্বশীল একজন মানুষে পরিণত করবে।

মেসো সিস্টেমঃ এই স্তরে মাইক্রো সিস্টেমের উপাদানগুলো পরস্পরের সাথে যেভাবে মিথস্ক্রিয়া করে এবং তার ফলশ্রুতিতে শিশুর উপর যে প্রভাব পড়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে- যখন কোন শিশুর বাবা-মা নিয়মিত তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন, সেই শিশুর পড়ালেখায় তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। একইভাবে, মাইক্রো সিস্টেমের উপাদানগুলির মধ্যে যদি ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া না হয়, তবে তা শিশুর জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এক্সো সিস্টেমঃ এই স্তরে রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাদের প্রভাব শিশুর জীবনে প্রত্যক্ষভাবে না পড়লেও পরোক্ষভাবে পড়ে থাকে। যেমন- দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বাবা-মায়ের কর্মক্ষেত্র, দেশের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি। যেমন- এটা খুবই স্বাভাবিক যে উন্নত দেশের শিশুদের

তুলনায় অনুন্নত দেশের শিশুরা পড়ালেখার ক্ষেত্রে কম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে যা তার পরবর্তী জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে।

ম্যাক্রো সিস্টেম: যে রাষ্ট্রে বা সমাজে শিশু বাস করে তার সামগ্রিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আইন ইত্যাদি বাস্তুসংস্থান তত্ত্বের সর্বশেষ স্তর। এই সমস্ত উপাদানের দ্বারাও শিশুর জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন- যে দেশে বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত, সে দেশের মেয়ে শিশুর পড়ালেখার পথে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকে।

ক্রোনো সিস্টেম: এই স্তরটি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে। মানব শিশুর উন্নয়নের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উপরের চারটি স্তরের উপাদান ছাড়াও তার জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা বা সময়ের খুব বড় প্রভাব থাকতে পারে। যেমন- কোন প্রিয়জনের মৃত্যু অথবা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ শিশুর বেড়ে ওঠা বা তার পড়াশুনার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

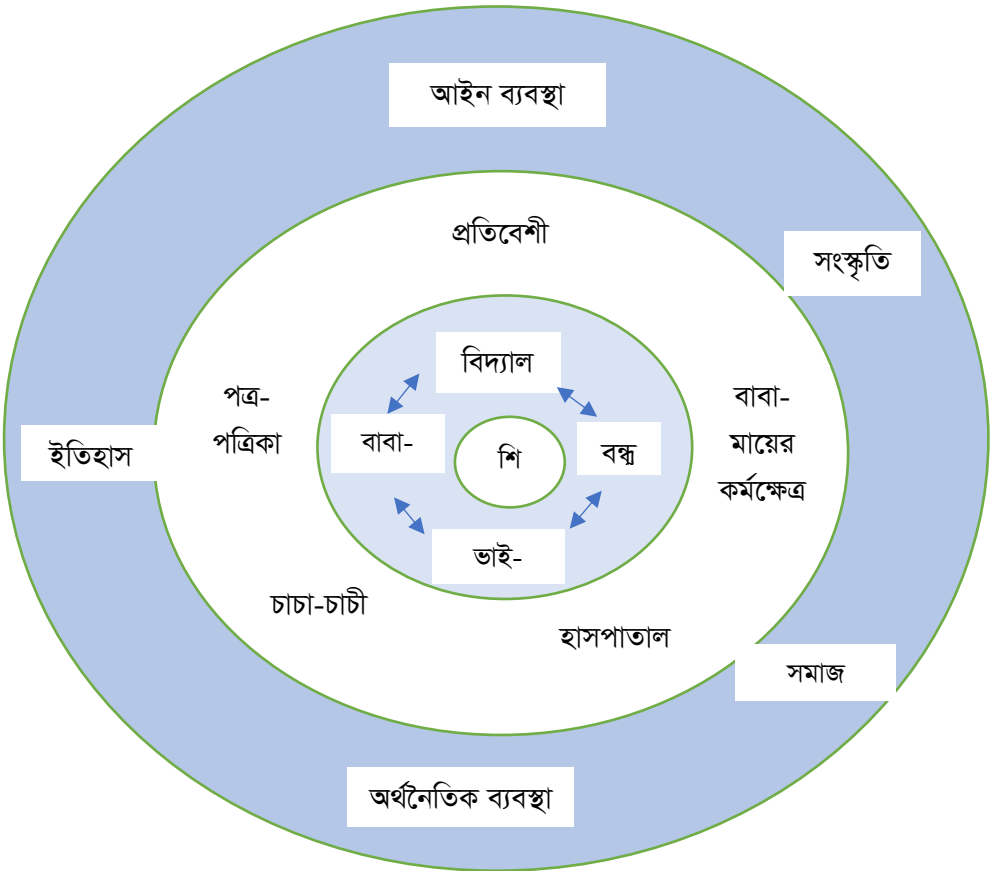

শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

অংশ-খ	শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়

শিশুর বিকাশঃ আচরণ, দক্ষতা, কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতাতে শিশুর যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে তাকে শিশুর বিকাশ বলে। এই বিকাশ বলতে শিশুর শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ- এই চারটি ক্ষেত্রের বিকাশকে বোঝায়।

শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতাঃ শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাকাল পর্বটি তার যত্ন ও বেড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবে শিশুর বুদ্ধি বিকাশের পাশাপাশি মস্তিষ্কের বিকাশের বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় প্রতিকূল পরিবেশ, খারাপ অভিজ্ঞতা, দরিদ্রতা তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা শিশুর সার্বিক বিকাশে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামাজিক শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কিছু জৈবিক ও মনো-সামাজিক উপাদান নিচে উল্লেখ করা হলো-

অপুষ্টিজনিত কারণঃ যে সকল শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে তাদের বয়সের তুলনায় ওজন ও উচ্চতা কম হয়। তারা কোনো কিছুতে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারেনা, সকলের সাথে মিলেমিশে খেলতে, কথা বলতে আগ্রহী হয়না ফলে তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কম হয় যা তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

আয়োডিন ও আয়রন ঘাটতিজনিত কারণঃ থাইরয়েড শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশে প্রভাব ফেলে। আয়োডিনের অভাবে জন্মগতভাবে হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে যা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে বড় কারণ। আবার, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৪ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার ব্যপকতা ৪৬-৬৬% পর্যন্ত দেখা যায় যার মূল কারণ হিসেবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এ্যানিমিয়া বলে মনে করা হয়। এর ফলে শিশুদের মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক ও স্নায়ুশরীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয় যার প্রভাব স্বল্পমেয়াদী এবং জীবনব্যাপী হতে পারে।

জিঙ্ক এবং ভিটামিন এ ও বি ১২ এর প্রভাবঃ জিঙ্কের ঘাটতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো অসুস্থতা এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। প্রয়োজনীয় জিঙ্ক এর অভাব শিশুদের মনোসামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও আচরণগত বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

সংক্রামক রোগের প্রভাবঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগ ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অন্ত্রেও হেলমিন্থের (এক প্রকার সংক্রামক রোগ) অন্তত একটি প্রজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং উচ্চমাত্রায় সংক্রমিত হয়েছে বিদ্যালয়গামী শিশুরা। এর প্রভাবে তাদের ভাষাগত দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এবং শারীরিক, বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়েছে।
এছাড়াও শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগের সংক্রমণ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং অনুন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বিশ্ব জনসংখ্যার ৪০% এর ও বেশি অর্থাৎ ৯০টি দেশের মানুষ ম্যালেরিয়ার উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে। এর মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ছিল যার ফলে তাদের স্নায়ুবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

পরিবেশগত প্রভাবঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশগত প্রভাবের মধ্যে সীসার প্রভাব অন্যতম একটি ক্ষতিকর দিক। কসোভোতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে সীসাযুক্ত এলাকায় বসবাসরত শিশুদের

মেধাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারিরীক, দৃষ্টি, সামাজিক ও আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে যারা আর্সেনিক যুক্ত কূপ থেকে পানি পান করেছে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। আবার, বাংলাদেশে বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে যারা ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর সংস্পর্শে এসেছে তারাও একইভাবে কম উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন।

মনোসামাজিক ঝুঁকির কারণসমূহঃ গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিকাশে মা-বাবার ভূমিকা মূলতঃ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- শিশুকে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা প্রদান, শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং দায়িত্ব। তাই এই বিষয়গুলোর ঘাটতি শিশুর বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই বিষয়গুলোর প্রভাব একটি দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং এগুলোর চর্চার ওপর নির্ভর করে।

মা-বাবার ভূমিকাঃ শিশুর বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশুকে উদ্দীপনা প্রদান এবং শেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া যা শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যেকোনো কিছু শিখতে আগ্রহী হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে শিশুর সামাজিক আচরণ, মিলেমিলে খেলার দক্ষতা, ইতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। পারিবারিক পরিবেশে এসকল বিষয়গুলো অনুপস্থিতি শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

মাতৃত্বকালীন বিষন্নতাঃ গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিকভাবে বিষন্ন মায়েরা শিশুর সাথে কম সময় দেয়, তাদের আদর-যত্ন কম করে এবং নেতিবাচক আচরণ বেশি করে যা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।
এছাড়াও শিশুর প্রতি অতিরিক্ত শাসন ও নিয়মনিষ্ঠা, অতিমাত্রায় প্রশংসা করা ও ভালোবাসা, অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিশুর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অংশ-গ	**শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায়**

শিশুর বিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য পরিবার, সমাজ এবং শিক্ষকের সম্মিলিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠার পদ্ধতি তুলে ধরা হলো:

১. পরিবারে স্বাস্থ্যকর এবং সহমর্মিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
২. স্কুলে শিশুকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ দেওয়া।
৩. বুলিং বা নেতিবাচক আচরণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
৪. শিশুকে ভালোবাসা, সমর্থন এবং শ্রদ্ধার পরিবেশ প্রদান।
৫. বুলিং বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া এবং সমতা নিশ্চিত করা।
৬. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাদের মানসিক সমর্থন প্রদান।
৭. পিতা-মাতা ও শিক্ষকের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা।
৮. পরিবার ও স্কুলের সম্পর্ক দৃঢ় করা।
৯. অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত মিটিং আয়োজন করা।
১০. অভিভাবকদের শিশুর শিক্ষা ও মানসিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা।
১১. পরিবারের সমস্যা বুঝে শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া।
১২. পিতা-মাতার কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমানোর উদ্যোগ নেওয়া।
১৩. শিশুদের জন্য স্কুলে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা।
১৪. সমাজের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

১৫. স্কুল ও সমাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, যেমন দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম।
১৬. সমাজে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
১৭. সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা।
১৮. শিশুদের মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।
১৯. কম সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য সহায়তা বা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম প্রবর্তনে উদ্যোগী হওয়া।
২০. সময়মতো শিশুদের মানসিক ট্রমা নিরসনের ব্যবস্থা নেওয়া।
২১. কোনো ট্রমার বিষয়টি বুঝে অভিভাবক এবং প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবার সঙ্গে যোগাযোগ করা।
২২. শিশুদের সঙ্গে মানসিক সংযোগ তৈরি করে তাদের কথা শোনা।
২৩. সময়মতো শিশুকে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান।

তথ্যসূত্রঃ

১. দ্য ল্যানসেট সিরিজ-১, ২০০৭, DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60076-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17223478/
২. Trawick-Smith, J. (2006) Early Childhood Development: A Multicultural Perspective (4th Edition). New Jersey: Pearson/Merrill/Prentice Hall. Ecological systems theory derived from https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_systems_theory

সহায়ক তথ্য-০৬	শিশুর বিকাশ ও যত্নে করণীয়

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বিকাশ ও যত্নে নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর পাঁচটি উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকে শিশুর বিকাশ নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকের করণীয় কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিশুর বিকাশ ও যত্নে খাদ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর বিকাশ ও যত্নে নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর উপাদানসমূহ

Component of Nurturing Care

গর্ভকাল থেকে জন্মের পর প্রথম পাঁচ বছর শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এসময়ে শিশু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। ২০১৮ সালে ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহারের জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পরিচর্যা ও যত্ন কাঠামো প্রণয়ন করেছে। 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের পরিচর্যা ও যত্ন কাঠামো' কাঠামোতে ০ থেকে ৩ বছর বয়সি শিশুদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই কাঠামোটিতে শিশুর পরিচর্যা ও যত্নের কাজটি ভালোভাবে করার জন্য পরিচর্যা ও যত্নসমূহকে পাঁচটি উপাদানে বিন্যাস করা হয়েছে। যেহেতু প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ, স্বাস্থ্য, শিখন তথা সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তি তৈরি হয় এবং পরবর্তী বয়সে তা স্থায়ী হয়, তাই এই কাঠামোর উল্লিখিত পাঁচটি উপাদান আন্তঃসম্পর্কিত এবং একটি আরেকটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যা শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব ফেলে এবং শিশুর সর্বোত্তম বিকাশে ভূমিকা ও রাখে।

নার্চারিং কেয়ার কাঠামোর উল্লিখিত পাঁচটি উপাদানে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সেবার কথা নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. **সুস্বাস্থ্য:** শিশুর টিকাদান, নবজাতক, রোগাক্রান্ত শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা ও সমন্বিত শিশুর চিকিৎসা, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ সেবা এবং শিশু ও যত্নকারীর মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য সহায়তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

২. **পর্যাপ্ত পুষ্টি:** গর্ভকালীন সময় থেকে প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকাল পর্যন্ত শিশুর পর্যাপ্ত পুষ্টি, শিশুর ওজন ও উচ্চতা মনিটরিং ও রেফার করা, অপুষ্ট শিশুর চিকিৎসার সেবাসমূহ এ উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। মাঝারি ও মারাত্মক ধরনের অপুষ্টি এবং মাত্রাধিক ওজন/স্থুলতা থাকলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শিশুকে কৃমির বড়ি ও সম্পূরক ভিটামিন-এ খাওয়ানো, অসুস্থ/রোগাক্রান্ত শিশুকে যথোপযুক্ত খাবার খাওয়াতে সহায়তা করা এর অন্তর্গত।

৩. **সংবেদনশীল যত্নঃ** মা-বাবা/যত্নকারী/শিক্ষকের এমন কাজ করা যা শিশুকে তার সাথে খেলতে ও ভাবের আদান-প্রদান/কথা বলতে উৎসাহিত করে। শিশুর ইঙ্গিত/ইশারা (child's cues) অনুযায়ী স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতার সাথে বড়দের কাজ করা। বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর সেবা-যত্নে সম্পৃক্ত করা। সর্বোপরি শিশুর সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সহযোগিতা প্রদান।

৪. **প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগঃ** শিশুর সাথে বয়স অনুযায়ী খেলা করা, গান/ছড়া/বই পড়ে শুনানো ও গল্প বলা এবং এগুলো কীভাবে করতে হবে সে ব্যাপারে শিক্ষককে/যত্নকারিকে সহযোগিতা দেওয়া। মা-বাবাকে প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগগুলো সম্পর্কে তথ্য, উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং গৃহকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু ও ঘরে বানানো খেলনার মাধ্যমে শিশুকে শেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক প্রারম্ভিক শিখন ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, বই ভাগাভাগি, খেলনা ও বইয়ের লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এর অন্তর্গত।

৫. **সুরক্ষা ও নিরাপত্তাঃ** শিশুর জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, বাড়িতে-বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধির চর্চা, বায়ু দূষণ কমানো ও প্রতিরোধ করা, নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, বাইরে খেলার স্থানের ব্যবস্থা করা, নিকটজন/ঘনিষ্ঠজন কর্তৃক ও পরিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়গুলো এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অংশ-খ	নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর আলোকে শিশুর বিকাশ নিশ্চিতকল্পে শিক্ষকের করণীয় কী তা চিহ্নিত করতে পারবেন

এই কাঠামোতে ০ থেকে ৩ বছর বয়সি শিশুদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও যেহেতু আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে কাজ করব যাদের বয়সসীমা হলো ৪-১০ বছর আমাদের এই কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে।

এই কাঠামো উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে উল্লিখিত উপাদানগুলো শুধু ০-৩ বছর বয়সি শিশুদের জন্যই নয় বরং শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশব পরবর্তী জীবনেও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই ফ্রেমওয়ার্ক এর ৫টি উপাদানে উল্লিখিত সেবাসমূহ শিশুরা যে পরিবেশে থাকুক না কেন তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। তাই বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সাথে যুক্ত শিক্ষককে এই সেবাসমূহ সম্পর্কে জানতে হবে। যাতে শিশুর মা-বাবাকেও এ সেবা প্রদানের এই ৫টি উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত করতে পারেন। একই সাথে শিশু ও মায়ের যত্ন ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং মা-বাবার ভালো থাকার সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যত তৈরির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর ৫ টি উপাদানের আলোকে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশুদের মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষক হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করার সময় তাঁর ভূমিকা হতে পারে মানবিক, যত্নশীল ও দায়িত্বশীল। নিচে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষকের করণীয় তুলে ধরা হলো:

১. **সুস্বাস্থ্যঃ**

- **শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিঃ** শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়া, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা।
- **সরাসরি পর্যবেক্ষণঃ** শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা এবং অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে অভিভাবকদের জানানো।

- **সহযোগিতা:** বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম (যেমন: টিকা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য শিবির) আয়োজনের জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা।

২. পর্যাপ্ত পুষ্টি:

- **পুষ্টির গুরুত্ব বোঝানো:** শিশুদের এবং অভিভাবকদের পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা।
- **মধ্যাহ্নভোজ পর্যবেক্ষণ:** যদি স্কুলে মিড-ডে মিল বা টিফিন কার্যক্রম থাকে, সেগুলির মান নিশ্চিত করা এবং শিশুদের সুষম খাবার খেতে উৎসাহিত করা।
- **খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যক্রম:** শিশুদের সক্রিয় রাখার জন্য শারীরিক শিক্ষা ক্লাস বা খেলাধুলার আয়োজন করা যা তাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

৩. সংবেদনশীল যত্ন:

- **ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি:** শিশুদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং উৎসাহ প্রদান করা।
- **ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রদান:** প্রতিটি শিশুর সক্ষমতা, দূর্বলতা এবং আবেগিক প্রয়োজনগুলো বুঝে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা।
- **সমন্বিত কার্যক্রম:** অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগ:

- **শিক্ষা কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনা:** পাঠ্যসূচির পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলা, গল্প বলা, গান শেখানো এবং সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ দেওয়া।
- **উদ্দীপনা প্রদান:** শিক্ষার্থীদের কৌতূহল বাড়াতে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া এবং তাদের সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা।
- **শিক্ষার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি:** শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে সাজানো যেখানে শিশুদের শিখতে এবং খেলতে আরামদায়ক বোধ হয়।

৫. নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা:

- **শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ:** বিদ্যালয়ে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা এবং কোনো নির্যাতন বা অবহেলা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া।
- **নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা:** বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো (যেমন: খেলার মাঠ, শ্রেণিকক্ষ) নিরাপদ রাখা এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো এড়ানো।
- **মানসিক সহায়তা প্রদান:** শিশুদের মানসিক চাপ বা ভীতি থেকে মুক্ত রাখতে শিক্ষকের সহানুভূতিশীল এবং ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা।

নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এর ৫টি উপাদানের আলোকে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন যা শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সহায়ক এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এবং বিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অংশ-গ	**শিশুর বিকাশ ও যত্নে খাদ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।**

খাদ্যের ধারণাঃ

যে সকল বস্তু খেলে শরীরের ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা যায়, তা-ই খাদ্য।

খাদ্যে ৬ ধরণের উপাদান থাকে-

১। আমিষ বা প্রোটিন
২। শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
৩। স্নেহ বা চর্বি জাতীয়
৪। খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন
৫। খনিজ লবণ
৬। পানি

পুষ্টির ধারণাঃ

খাদ্যের উপাদানসমূহ যে প্রক্রিয়ায় মানবদেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বৃদ্ধি, তাপ ও শক্তি যোগান এবং দেহকে সবল ও রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে তাকেই পুষ্টি বলে।

সুষম খাদ্যঃ

যে খাদ্যে খাদ্যের প্রয়োজনীয় ৬টি উপাদান নির্দিষ্ট পরিমানে ও সঠিক অনুপাতে থাকে এবং শরীরের যাবতীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

খাদ্যাভ্যাসঃ

সমগ্র বিশ্বে জাতিগত, ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কারণে খাদ্যাভ্যাসের প্রচলন দেখা যায়। যেমন, বাংলাদেশে সমতল অঞ্চল এবং পাহাড়ি অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন। বাসবাসের স্থান, খাদ্য উপকরনের সহজলভ্যতা, শারীরিক চাহিদাপূরণ, পারবিবারিক এবং সামাজিক মানুষ যেই ধরনের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সেটি খাদ্যাভ্যাস নামে পরিচিত।

শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠনে বিভিন্ন বিষয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে যেগুলো তার খাদ্য গ্রহণের ধরণ এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিশুর পারিবারিক গঠন, সামাজিক প্রথা, পারিবারিক আয়, শিক্ষার স্তর, খাদ্য উপকরণের সহজলভ্যতা, ব্যক্তিগত রুচি, চাকুরি ও পেশা, বসবাসের স্থান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যোগাযোগ, আবহাওয়া ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশে খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব :

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশীর জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। শিশুর জীবনের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

- খর্বাকৃতি রোধ: শিশুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মতো সুষম ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।
- অস্বাস্থ্যকর চর্বি (ফ্যাট) রোধ: শিশুকে স্বাস্থ্যকর খাবার না দিলে শিশুর শরীরে অস্বাস্থ্যকর চর্বি জমা হবে যা শিশুকে মুটিয়ে দিবে। অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট শিশুর ব্রেনের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাই শিশুকে জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড না দিয়ে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সুষম খাদ্যাভ্যাস শিশুর ব্রেনের বিকাশে সহায়তা করে।

- শিশুর বেড়ে উঠা: শিশুর বেড়ে উঠার প্রতি সচেতন থাকলে শিশুর পুষ্টি বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নির্ণয় করা যায়। কমপক্ষে ৬ বছর পর্যন্ত শিশুর গ্রোথ চার্টের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নের স্বাভাবিকভাবে হবে।
- শিশুর অসুস্থতা রোধ: শিশুর সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তার দেহ ইনফেকশন ও অসুস্থ্যতা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস শিশুর অসুস্থতার প্রবণতাকে কমাতে পারে।
- শক্তিশালী পরিপাক ব্যবস্থা গড়ে তোলা: শিশুর শক্তিশালী পরিপাক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরি করতে হবে। পরিপাকতন্ত্রের বিকাশ শিশুর দ্রুত হজম হতে সহায়তা করে। এতে শিশুর ভালো ঘুম হয়।
- মেধার বিকাশ: শিশুর স্বাভাবিক মেধার বিকাশের জন্য চাই সঠিক খাদ্যাভ্যাস।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা এবং করণীয়:

- শিশুদের খাদ্য সম্পর্কে অবহিত করা।
- শিশুদের সুষম খাবারের সাথে পরিচিত করানো।
- অভিভাবক সভা, মা সভা, উঠান বৈঠক, হোম ভিজিট করার সময় খাদ্যে ভেজাল এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ
- শিশুর অভিভাবকদের খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে অবহিত করা।
- বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ভেজাল খাদ্য সম্পর্কে ব্যানার বা পোস্টার লাগানো।

সহায়ক তথ্য-৭	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ও করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবকালে মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ

প্রারম্ভিক বছরের সার্বিক বিকাশের ওপর মস্তিষ্কের গঠন নির্ভর করে। সাধারণভাবে মস্তিষ্ককে দুভাগে ভাগ করা হয়- ডান মস্তিষ্ক এবং বাম মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কের বাম অংশ: যৌক্তিক চিন্তা ও ভাষা পরিচালনা, গণিতে দক্ষতা, ডান দিকের দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ কাজ করে।

মস্তিষ্কের ডান অংশ: স্থান, অবস্থান ও শ্রবণ ধারণা পরিচালনা, সঙ্গীত ও সৃজনশীলতা, বাম দিকের দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের গঠন

প্রতিটি মানুষের
মস্তিষ্কের গঠন
একই রকমের হয়।

মস্তিষ্কের বাম ও ডান অংশ

- মস্তিষ্কের দুই অংশ সমান
- আকৃতিগত ভাবে দুই অংশ একই রকম
- কার্যকারিতা অনুযায়ী দুই অংশ ভিন্ন
- দুই অংশই সংযুক্ত

নমুনা চিত্রঃ মস্তিষ্কের গঠন

মস্তিষ্কের বিকাশঃ শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্কের বিকাশ সবচেয়ে বেশি হয়। মস্তিষ্কের নিউরনের সংযোগ সৃষ্টিতে এবং বৃদ্ধির জন্য শিশুকে উদ্দীপনা (আদর করা, কথা বলা, হাসা, ছড়া, খেলা করা) প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন উদ্দীপনা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সংযোজিত হতে সহায়তা করে। একটি শিশুর মস্তিষ্ক পূর্ণতা পায় দুইদিক থেকে যেমন-

আকৃতিগত বৃদ্ধির মাধ্যমেঃ আকৃতিগত বৃদ্ধির মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষের (neuron) সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। **সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমেঃ** একটি নিউরনের সাথে আরেকটি ও একাধিক নিউরণের সংযোগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্তর্জাল তৈরি হয় (neural connection & network formation)। মস্তিষ্কের একটি কোষ সর্বোচ্চ ১৫,০০০ কোষের সাথে সংযোগ করতে পারে। শিশুর ৩ বছর বয়সের মধ্যে ৭০-৮০% এবং ৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রায় ১০০% সংযোগ স্থাপিত হয়। তাই এই বয়সে যত বেশি পারস্পারিক ক্রিয়া (Interaction) ঘটে তত বেশি সংযোগ তৈরি হয়। এভাবে শিশুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক পূর্ণতা লাভ করে। তাই নিউরনের সংযোগ ঘটাবার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ (Windows of Opportunities) হলো জন্ম থেকে ৫ বছর বয়সকাল। আবার, এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে তা হারিয়ে যায় অর্থাৎ এটি 'ব্যবহার না করলে হারিয়ে ফেলবে' (use it or lose it) প্রক্রিয়ায় কাজ করে। ৫-৬ বছর বয়সের পর নতুন সংযোগ তৈরি না হলেও সংযোগের স্থায়ীত্বের জন্য শিশুর ৮ বছর বয়স পর্যন্ত পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন (Interactive Care) চালিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্কের বিকাশের কিছু মৌলিক তথ্য

- মস্তিষ্কের নিউরনের সংখ্যা বৃদ্ধির অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো মায়ের গর্ভে থাকাকলীন অবস্থায় এবং সংযোগ বৃদ্ধি ও অন্তর্জাল তৈরির সময় হলো জন্মের পর।
- নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও অন্তর্জাল তৈরি ছাড়া মস্তিষ্ক কাজ করতে পারে না।
- সংযোগ স্থাপন ও অন্তর্জাল তৈরির পূর্বশর্ত হলো নিউরনগুলোর উদ্দীপ্তকরণ (Stimulation)।

- শিশুর সাথে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) করা ও করার সুযোগ করে দেওয়া নিউরনগুলোকে উদ্দীপ্ত করার একমাত্র উপায়।
- মস্তিষ্কের এক এক অংশ এক এক ধরনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তাই মস্তিষ্কের সব অংশের নিউরনগুলোকেই উদ্দীপ্ত (Stimulate) করা প্রয়োজন।
- শিশু তার ৫টি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করার সুযোগ পায় এমনভাবে মিথস্ক্রিয়া করলে মস্তিষ্কের সব অংশের নিউরন উদ্দীপ্ত (Stimulated) হয়ে সার্বিকভাবে নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে ও অন্তর্জাল তৈরি হবে।

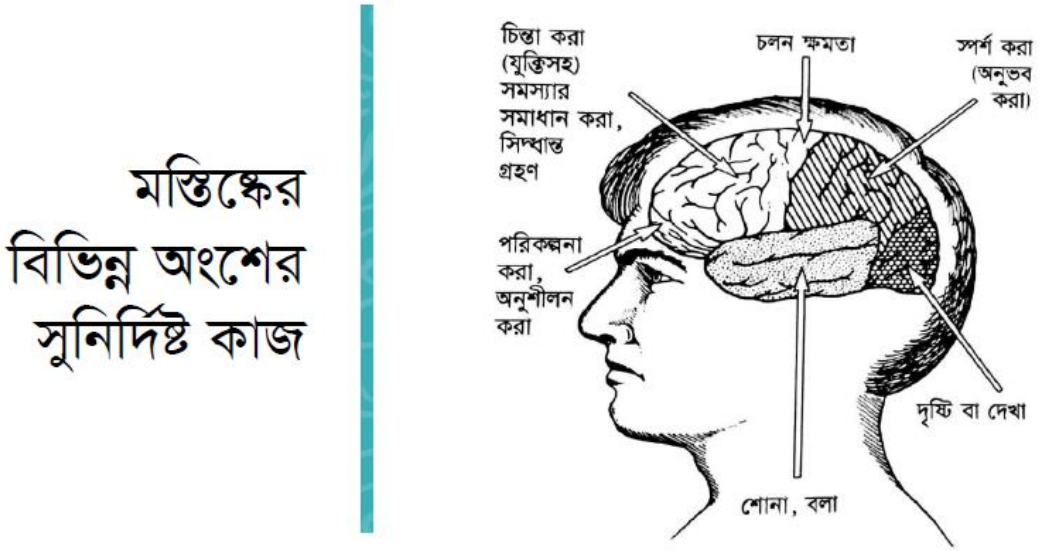

নমুনা চিত্রঃ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সুনির্দিষ্ট কাজ

মস্তিষ্কের বিকাশের গুরুত্বঃ

- জন্ম থেকে ৫ বছর বয়সে ৮০-৯০% সংযোগ ঘটে বা স্থাপিত হয়। এর মধ্যে অধিক সংখ্যক সংযোগ ঘটে প্রথম ৩ বছর বয়সের মধ্যে।
- ৫ বছর বয়সের পর নিউরনের সংযোগ স্থাপন করার সক্ষমতা লোপ পায়।
- এ সময় মস্তিস্ক গঠনের মূল ভিত্তি তৈরি হয়।
- শিশুর ভাষার বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, দেখা, শোনা, স্মৃতিশক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নির্ভর করে মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশের ওপর।

অংশ-খ	শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে মা-বাবা, শিক্ষক ও বড়দের করণীয়

শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় মায়ের খাদ্য, পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সর্বোপরি মায়ের ভালো থাকা শিশুর মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তার জন্য জন্মের পূর্ব থেকেই মায়ের যত্ন নিতে হবে। জন্মের পর থেকেই শিশু শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে। পরিবারে মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্য ও শিক্ষকের সঠিক পরিচর্যা, যত্ন ও উদ্দীপনামূলক কাজের মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের কোষের সংযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নার্চারিং কেয়ার ফ্রেমওয়ার্ক এ প্রদত্ত ৫টি উপাদানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করা যেতে পারে। শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তার জন্য মা-বাবা, শিক্ষক ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। যেমন-

- শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা।
- শিশুকে উদ্দীপনা প্রদান করা যেমন
  - শিশুর সাথে কথা বলা, চোখে চোখ রাখা, হাসা
  - শিশুকে জড়িয়ে ধরা, আদর ও ভালোবাসা দেওয়া
- শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সাড়া দেওয়া অর্থাৎ শিশুর অঙ্গভঙ্গি, ইশারা, মুখভঙ্গি ইত্যাদি দেখে তাকে সাহায্য করা (সংবেদনশীল যত্ন নেওয়া)।
- প্রারম্ভিক শিখনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। যেমন- শিশুর সাথে ছড়া, খেলা করা, খেলার মাধ্যমে প্রাক-গাণিতিক, পরিবেশ-বিজ্ঞানের ধারণা দেওয়া, গান করা ও গল্প শোনানো ইত্যাদি।
- ইতিবাচক ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি করা।
- বিদ্যালয়ের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- পর্যাপ্ত পরিমান বয়সোপযোগী খেলনা ও উপকরণ রাখা।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা রাখা।
- সৃজনশীলতার বিকাশে বিভিন্ন কাজে শিশুকে উৎসাহিত করা।
- শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব ও শৈশবে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক যত্ন ও উদ্দীপনা (interactive care & stimulation) দেওয়ার মূলনীতি হলো-
  - প্রতিদিন বারবার করা (Everyday Repeatedly)
  - বয়স অনুযায়ী করা (Age Appropriate)
  - নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে করা (Safe & Enabling Environment)
  - বিভিন্নভাবে করা (Multiple Ways) যাতে শিশু তার পঞ্চইন্দ্রিয় ও হাত-পা ব্যবহার করার সুযোগ পায়
  - ছেলে-মেয়ে শিশুর সাথে সমানভাবে করা।

এই মূলনীতিসমূহ বোঝার সুবিধার্থে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন-

- **বয়স অনুযায়ী:** খাবার পানি রাখার জন্য যদি মাটির কলসি ব্যবহার করতে হয়, প্রথমে মাটির কলসি তৈরি করতে হবে। মাটির কলসি তৈরির প্রক্রিয়া হলো: প্রথমে মাটি পানি দিয়ে মিশিয়ে মন্ড তৈরি করে তারপর কলসির আকৃতি বানিয়ে কয়েকদিন রোদে শুকানো, তারপর আগুনে পুড়িয়ে আবার কয়েকদিন রোদে শুকালে পানি রাখা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় কেউ যদি রোদে শুকানোর পরই পানি রাখে

তাহলে কলসিটি কিছুক্ষণ পর গলে যাবে। তেমনি শিশুর বয়স অনুযায়ী ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কোনোকিছু চাপিয়ে দিলে তা শিশুর জন্য ক্ষতিকর হবে।

- **নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশঃ** শিশুকে খেলনা কিনে দিয়ে খেলনাটি বাক্সে রেখে দিলে বা শিশুকে অন্ধকার ঘরে রেখে দিলে শিশুটি কিন্তু খেলনাটি ব্যবহার করতে পারবে না বা খেলতেও পারবে না। অথবা খেলনা দিয়ে শিশুকে ধমক দিয়ে খেলতে বললে শিশুটি আনন্দ নিয়ে খেলবে না।মানসিক দিক থেকে সে ভালো থাকবে না এবং খেলনা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে না।
- **পঞ্চইন্দ্রিয় ও হাত-পা ব্যবহার করার সুযোগঃ** মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- দেখা পিছনের দিকের নিচের অংশ, শোনা-বলা নিচের অংশের মধ্যভাগ, স্পর্শ (অনুভব) করা পিছনের দিকের উপরের অংশ, চলন ক্ষমতা উপরের দিকের (তালুর) মধ্যভাগ, চিন্তা/যুক্তি/সমস্যার সমাধান/সিদ্ধান্ত গ্রহণ তালুর সামনের দিক ও কপালের পিছনে উপরের অংশ, পরিকল্পনা ও অনুশীলন করা সামনের দিকের নিচের (কপালের পিছনের) অংশ। তাই শিশুকে শুধু দেখতে বা শুনতে দিলে তার মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখা ও শোনা নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত সেই অংশের কোষগুলো সক্রিয় হবে ও সেগুলোর মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে। অন্য অংশের কোষগুলো সরাসরি সক্রিয় হবে না এবং সেগুলোর মধ্যে পুরোপুরি সংযোগ তৈরি হবে না। তাই শিশুকে এমনভাবে উদ্দীপনা ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক যত্ন দিতে হবে যাতে মস্তিষ্কের সব অংশের কোষগুলোই উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় হয়ে সংযোগ তৈরি করতে পারে। আর এজন্য শিশুকে এমনভাবে পারস্পারিক ক্রিয়ামূলক যত্ন দেওয়া যাতে সে তার পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথা: চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

তথ্যসূত্রঃ

১. Experiences Build Brain Architecture, Center on the Developing Child by Harvard University

২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিমার্জিত ও সংশোধিত: মার্চ ২০১৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সহায়ক তথ্য-০৮	অধিবেশন-০৮: শিশুর শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর শারীরিক ও কার্যক্ষমতা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর শারীরিক ও কার্যক্ষমতা বিকাশে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন ।

অংশ-ক	শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া

বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক শিশুর শারীরিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। যেমন-

- শিশু নিয়মিত শারীরিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। যেমন- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করতে পারে।
- যেকোনো ধরনের নড়াচড়া অনুকরণ করতে পারে, বাই-সাইকেল চড়তে ও চালাতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, গাছে বা উঁচু স্থানে চড়তে পারে, শরীরের বিভিন্ন অংশের গতিময়তা সমন্বয় করতে পারে।
- পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারণা রাখে এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে আগ্রহী হয়।
- শরীরচর্চার গুরুত্ব এবং পুষ্টিকর খাবার কী তা বুঝতে পারে এবং নিয়মিত খেলাধুলায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে চায়।
- সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারে এবং
- বয়সোপযোগী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা করতে পারে।
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে।
- নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখে এবং সে অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে শেখে।
- শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং নিজে এই পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে।

অংশ-খ	শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা

- পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা।
- নিয়মিত খেলাধুলায় অংশ না নেওয়া।
- বাড়িতে কোনোরকম পেশি সঞ্চালনার কাজে যুক্ত না থাকা।
- নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

- পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সুস্থ শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং শিশুকে প্রয়োজনীয় সুযোগ না দেয়া।
- শিশুর অসুস্থতা।
- দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলা ধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করার ব্যপারে অনীহা।

শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশে শিক্ষকের করণীয়

- পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা।
- শ্রেনিকক্ষে শিশুকে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ, হাঁটা-চলা, সবার সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধুলা, সহজ গৃহস্থালি কাজ ইত্যাদি নিজে নিজে করার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলে এগুলো করতে উৎসাহ দেয়া ।
- বিভিন্ন পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা।
- শিশুকে তার নিজের সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং তার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেষণা দেয়া ।
- পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সুস্থ শারীরিক ও কার্যক্ষমতার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়া- হোম ভিজিট, অভিভাবক সমাবেশে এ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া যেতে পারে ।
- প্রয়োজনে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিশু যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং নিজের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে পারে সে ব্যপারে তাকে সাহায্য করা। শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে না করে ব্যক্তিগতভাবে করা যেতে পারে ।

তথ্যসূত্র:

১. শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়), ২০২০: প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম রুপরেখা (২০২০), প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) (২০২০) পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড) তথ্যপুস্তক, ময়মনসিংহ।

সহায়ক তথ্য-০৯	শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ

শিশুর বিকাশকে যে চারটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও রয়েছে। বয়সের সাথে সাথে শিশু বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করতে থাকে, যেমন- কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, সমস্যা সমাধান করা, যুক্তিপূর্ণভাবে কোন কিছু বুঝা এবং বুঝানো ইত্যাদি। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বলতে শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে এই যৌক্তিক আচরণের উন্মেষ ঘটাকে বুঝানো হয়। শিশু তার আশেপাশের মানুষ এবং পরিবেশের সাথে তার সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা অর্জন করে।

সুইডিশ মনোবিজ্ঞানী জ্যাঁ পিঁয়াজে সর্বপ্রথম শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর এই সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে শিশুর শিখন শুধুমাত্র তার পিতা-মাতা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রাপ্ত শিক্ষাতেই থেমে থাকে না, বরং সে নিজে নিজে প্রতিদিন পরিবেশ থেকে নতুন নতুন জিনিস শেখে। পিয়াঁজে জন্ম থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত (যা তার পরবর্তী জীবনের ভিত রচনা করে) শিশুর এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন; এমন না যে সব শিশু একই বয়সে একই স্তর অতিক্রম করবে, তবে প্রত্যেককেই একটি স্তর অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে হবে। নিচে পিয়াঁজে বর্ণিত শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের স্তরগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। ইন্দ্রিয়-পেশীর সমন্বয়কাল (Sensorimotor stage): ০-২ বছর

এই বয়সে শিশু তার হাত-পা বা শরীর নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়ে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিবেশ থেকে নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে শেখে। এই সময়ে শিশুর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে সাধারণত সে যা পেতে চায় তার জন্য সে কীভাবে তার পেশী এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে কাজে লাগাচ্ছে তার মাধ্যমে।

২। প্রাক-প্রায়োগিক স্তর (Pre-operational stage): ২ বছর-৬/৭ বছর

এই বয়সে শিশু ধীরে ধীরে প্রতীকের ব্যবহার (ভাষা, ছবি, ইশারা ইত্যাদি) বুঝতে শিখে; যদিও বাস্তব উপকরণের সাহায্যেই তার শিখন বেশি কার্যকর হয়। শিশু এই বয়সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা (Ego-Centrism) করে, তার মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা (Concept of conservation) তৈরি হয় না এবং বিভিন্ন বস্তুকে সে একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাজাতে পারে না (Decentring)।

৩। বাস্তব প্রায়োগিক স্তর (Concrete Operational stage): ৮-১১ বছর

এই বয়সে শিশু ধীরে ধীরে বিমূর্ত চিন্তা করতে শেখে; পাশাপাশি যুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে শিখে। এই পর্যায়ে তাদের মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা তৈরি হয়। সে আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে

শিখে। এছাড়া এই সময়েই শিশু বিভিন্ন বস্তুকে সে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে সাজাতে (Seriation এবং Decentring) শিখে। বস্তুর অবস্থা বা ঘটনার বিপরীতমুখীতা (Reversibility) সে এই বয়সে বুঝতে শিখে।

৪। রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক স্তর (Formal Operational stage): ১১ বছর+

এই স্তরে শিশুরা পুরোপুরি বিমূর্ত চিন্তা করতে সক্ষম হয়। সে সুদূর অতীতের কথা মনে করতে পারে কিংবা ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাসমূহঃ

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রায়োগিক এবং বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিখন প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানব।

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রায়োগিক এবং বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিখন প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতাগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানব।

আত্ম-কেন্দ্রিকতা (Ego-Centrism): এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে শিশু মনে করে সে যেভাবে কোন বিষয় বা বস্তুকে দেখছে, অন্যরাও সেভাবেই দেখছে। অন্যের মতামত বা যুক্তি তারা বুঝতে পারে না।

সংরক্ষণের ধারণা (Concept of Conservation): অবস্থা বা পাত্রের পরিবর্তন হলেই যে বস্তুর পরিমাণের পরিবর্তন হয় না- এটা বুঝতে পারা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। যেমন- ধরা যাক দুইটি একই রকম দেখতে গ্লাসে সমপরিমাণ পানি রাখা হলো। এরপর একটি গ্লাসের পানি অন্য আরেকটি লম্বা গ্লাসে ঢেলে শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন গ্লাসে বেশি পানি আছে? প্রাক-প্রায়োগিক স্তরে শিশু বলবে যে লম্বা গ্লাসে বেশি পানি আছে, অর্থাৎ তার মধ্যে সংরক্ষণের ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি; কিন্তু বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের শিশু বুঝতে পারবে যে দুটি গ্লাসেই সমপরিমাণ পানি আছে।

বিভিন্ন বস্তুকে এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাজানো (Seriation এবং Decentring): বিভিন্ন বস্তুকে কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্রমানুসারে সাজানোকে বলে Seriation। যেমন- শিশু তার খেলনাগুলিকে আকারের ভিত্তিতে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজাতে শিখে। আর শিশু যখন বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সাজানো শিখে তখন তাকে বলে Decentring। যেমন- শিশু বিভিন্ন খেলনাকে একই সাথে আকার এবং রঙের ভিত্তিতে আলাদা করতে পারে।

বস্তুর অবস্থা বা ঘটনার বিপরীতমুখীতা (Reversibility): এটি বাস্তব প্রায়োগিক স্তরের দক্ষতার একটি অনন্য মাত্রা। শিশু এই স্তরে কোন বস্তুর বর্তমান অবস্থা দেখে কল্পনা করতে পারে যে এটি পুনরায় তার পূর্বের/ আদি অবস্থায় ফেরত যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- শিশুর বলের বাতাস বের হয়ে চুপসে গেলেও সে হতাশ হয়ে পড়ে না, কেননা সে বুঝতে পারে যে বাতাস দিয়ে বলটিকে ফুলিয়ে আবারো খেলার উপযোগী করা সম্ভব।

অংশ-খ	শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের ভূমিকা

এই পর্যায়ে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব প্রাথমিক স্তরের শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য শিক্ষক কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেন।

আমরা যদি প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে শুরুর দিকে তাদের মধ্যে আত্ম-কেন্দ্রিক চিন্তা -ভাবনা (Ego-Centrism) কাজ করে। তারা অন্যের দিকটা বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভূমিকাভিনয়ে শিশুকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে অন্যের দিক বুঝতে সাহায্য করতে পারেন। আবার এই বয়সে শিশুরা বাস্তব উপকরণ দিয়ে শিখতে বেশি পছন্দ করে; কাজেই এই সময়ে শিশুর জন্য যত বেশি সম্ভব বাস্তব উপকরণভিত্তিক কাজ বা খেলার আয়োজন করতে হবে।

আবার শিশু যখন আরেকটু বড় হয়, তখন সে যুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা শিখে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। কিংবা, যেহেতু তারা সমাজে প্রচলিত প্রতীকী নিয়ম-কানুন বা মূল্যবোধ বোঝা শুরু করে, সামাজিক নাটক/ভূমিকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের চেষ্টা করা যেতে পারে। আবার, বিভিন্ন বস্তু/প্রাণীকে একাধিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো বা বিন্যাসের সক্ষমতা তৈরির জন্য শিক্ষক এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে কোন বিষয়ে যে কোন খেলা বা কার্যক্রম আয়োজন করতে পারেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিক্ষক যদি বয়সভেদে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারেন, তবে তিনি তার সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন খেলা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর এই বিকাশ ত্বরান্বিত করতে পারবেন।

তথ্যসূত্রঃ

১. Trawick-Smith, J. (2006) Early Childhood Development: A Multicultural Perspective (4th Edition). New Jersey: Pearson/Merrill/Prentice Hall.

২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০২০), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খণ্ড)

সহায়ক তথ্য-১০	শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিশুর ভাষা বিকাশের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে পারবেন;

ঘ. ভাষা বিকাশে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	**শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ এবং শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশের প্রক্রিয়া**

যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষা। ভাষা শেখার দক্ষতা নিয়েই শিশুরা জন্মায়। বয়সের সাথে সাথে শিশুর ভাষা বিকশিত হয়।

শিশুর ভাষা বিকাশকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- ১) প্রাক-কথন; এবং ২) কথা বলার স্তর।

প্রাক কথন স্তরে জন্মক্রন্দন থেকে কাকলি (ব্যাবলিং স্টেজ), ভঙ্গিমা ভাষণ থাকে। কথা বলার স্তরে থাকে অনুকরণ, অর্থবোধ, শব্দ সম্ভার ও বাক্য গঠন, ভাষণ প্রকৃতি, নিরব কথন, কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, উচ্চারণ ত্রুটি, তোতলামি।

প্রাক-কথন স্তরঃ জন্ম মুহূর্তের পর থেকে কথা বলে যোগাযোগ স্থাপনের আগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে প্রাক কথন স্তর।

১) **জন্মক্রন্দনঃ** সুস্থ শিশু জন্মের পরেই জন্মক্রন্দনের মাধ্যমে পৃথিবীর সাথে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম তিন মাস শিশু তার বিচিত্র স্বরধনির সাহায্যে তার অনুভূতি প্রকাশ করে। শিশু শুধু তার স্বরবৈচিত্রের সাহায্যে তার প্রক্ষোভ প্রকাশ করে তাই নয়, অন্যদের স্বর লক্ষ্য করে তাদের স্বরে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সংকেতও সে বুঝতে পারে। তাই কয়েক মাসের শিশুকে উপযুক্ত স্বরকল্পের উত্তেজিত, শান্ত, প্রশমিত করা যায়।

২) **কাকলিঃ** চার মাস থেকে নয় মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা যে অর্থহীন শব্দ করতে শেখে তার নাম শৈশব কাকলি। ভাষার মধ্যে যেসব শব্দ থাকে তার প্রায় সবই শিশুরা এ সময়ে উচ্চারণ করতে পারে। এই সময়ে তারা একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে, যেমন- মা মা। আমাদের কাছে এর অর্থ থাকলেও শিশুর কাছে শব্দটি পুনরাবৃত্তি মাত্র।

৩) **ভঙ্গিমা ভাষণঃ** শিশুরা বিভিন্ন দেহ ভঙ্গিমার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এটিও তাদের যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সামান্য প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পিতা-মাতা শিশুর বিভিন্ন দেহ ভঙ্গিমার অর্থ সহজেই বুঝতে পারেন।

কথা বলার স্তরঃ প্রাক কথন স্তরে কথা বলার প্রস্তুতি শেষে এই স্তরে পরিবারের সবাইকে অনুকরণের মাধ্যমে কথা বলা শুরু করে। এই স্তরে যেসব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিশুরা যায় তা হলো-

অনুকরণঃ সুস্থ শিশুরা ছয়-সাত মাস বয়স হতেই পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। দশ-এগারো মাস বয়স থেকেই মামা, দাদা, বাবা কথাগুলো বলতে শেখে এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় ধীরে ধীরে মাতৃভাষা এবং বিদেশি ভাষার শব্দও আয়ত্ত করতে শেখে।

১) **অর্থবোধঃ** এই স্তরে শিশু বেশিরভাগ সময় একটিমাত্র শব্দের মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু কোন পরিবেশে শিশু শব্দটি বলছে, তার দেহভঙ্গিমা, পরিস্থিতি এসবের উপর নির্ভর করে শব্দের অর্থ। যেমন- শিশুর কোন বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা তৈরি হলেও সেই বস্তুর নাম বলে শিশু একেক সময় একেক অর্থ বা অনুভূতি প্রকাশ করে।

২) **পদ বা শব্দ সম্ভার ও বাক্যগঠনঃ** শিশুর প্রাথমিক কথোপকথনে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে, ক্রিয়া পদের ব্যবহার কম থাকে। বিশেষ্য পদ ব্যবহার করে তারা ক্রিয়া পদের কাজ সারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া পদের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এ বয়সে বিস্ময়সূচক শব্দের ব্যবহার করতে শিশুরা বিশেষ পছন্দ করে। বিশেষণ, সর্বনাম পদগুলো ব্যবহার ধীরে ধীরে বাক্যে আসতে থাকে। একপদ বাক্য ব্যবহার করার কিছুকাল পর শিশুর দ্বিপদ বাক্য ব্যবহার শুরু হয়। একটি বিশেষ্য পদ ও একটি ক্রিয়া পদ দিয়ে একটি দ্বিপদ বাক্য গঠিত হয়। বাক্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে।

৩) **ভাষণ প্রকৃতিঃ** শৈশবে শিশুর কথা বলা প্রথমে থাকে আত্মকেন্দ্রিক, ক্রমশ তা সামাজিক হয়ে উঠে। আত্মকেন্দ্রিক ভাষণ তিন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন- ১) পুনরুক্তি; ২) স্বগতোক্তি; এবং ৩) যৌথ স্বগতোক্তি। আবার ভাষা যখন সামাজিক হয়ে উঠে তখন শিশু ১) অন্যের সঙ্গে চিন্তা বিনিময় করে; ২) অন্যের সমালোচনা করে; ৩) অন্যকে আদেশ দেয়; ৪) অনুরোধ জানায়; ৫) ভয় দেখায়; ৬) প্রশ্ন করে; ৭) প্রশ্নের উত্তর দেয় ইত্যাদি।

৪) **নীরব কথনঃ** শিশুর অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব গোপন করতে শিখে এবং মনে মনে চিন্তা করতে শিখে। মনের ভাব প্রকাশ না করে মনে মনে চিন্তা করার নামই নীরব কথন।

৫) **কণ্ঠস্বরের উচ্চতাঃ** কোনো কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই ভারী হয়, আবার কারো কারো কণ্ঠস্বর হয় নিচু।

৬) **উচ্চারণ ত্রুটিঃ** শিশু যা শোনে তাই উচ্চারণ করে। অনেক সময় শিশু পরিচিতজনের কাছ থেকেও ভুল উচ্চারণ শিখে থাকে। যেসব শিশুর শ্রবণশক্তি ভালো, তাদের ভুল সংশোধন করে দিলে তারা দ্রুত সঠিক উচ্চারণ শিখে নেয়। আবার শিশুর শ্রবণশক্তি দুর্বল হলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শানুভূতির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৭) **তোতলামিঃ** অনেক সময় কথা বলতে গিয়ে শিশু ইতস্তত করে, বার বার একটি শব্দ বলে বা শব্দের আদি অক্ষর উচ্চারণ করে। শিশুর এই ভাষা বিকৃতির নামই তোতলামি। তোতলামি ভাষা বিকাশের এক বড় বাধা। তোতলামি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হলো শিশুর সঙ্গে সহানুভূতিমূলক আচরণ করা। শিশুকে এর জন্য উপহাস, তিরস্কার বা ধীরে কথা বলার উপদেশ দিলে তাতে আরো উল্টো ফল হতে পারে।

যোগাযোগঃ

প্রতিনিয়ত আমরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। কার্যকর এবং সহজবোধ্যভাবে তথ্য বা মতামত প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। ভাষা ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার মানে যোগাযোগ মৌখিক এবং অমৌখিক হতে পারে। যেমন- অভিব্যক্তি এবং লিখিত বার্তা ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করি। যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলি, আগ্রহের সঙ্গে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ ভূমিকা রাখে। যোগাযোগ ছাড়া চারপাশের পরিবেশের সাথে যুক্ত হওয়া যায় না। সঠিক যোগাযোগ সংঘটনের জন্য প্রয়োজন একজন ব্যক্তির, যার সাথে

যোগাযোগ করা হবে এবং একটি বিষয়, যার উদ্দেশ্যে কথা বলা হবে। যোগাযোগের জন্য যে সকল দক্ষতাগুলো প্রয়োজন তা হলো-

১. **খেলা:** শিশু নিজের হাত পা দিয়ে খেলে। এই শব্দ শুনে সে আনন্দ পায়। বয়সের সাথে সাথে খেলার মধ্য দিয়ে অনেক জটিল এবং কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করে।
২. **শোনা:** শিশু খেলতে খেলতে বিভিন্ন আওয়াজ বা শব্দের প্রতি মনোযোগী হয়। শব্দের বিভিন্নতা বুঝতে পারে।
৩. **অনুকরণ করা:** জীবনের শুরতেই মা এবং যত্নকারী শিশুর আওয়াজ অনুকরণ করেন। শিশুটিও তাদের অনুকরণ করে। খেলার ছলে অনুকরণ করা পালাক্রমে রূপ নেয়।
৪. **পর্যায়ক্রমিক পালা:** একটু পরিপক্ক হলে শিশু কাঠামোবদ্ধভাবে পালাক্রম অনুসরণ করে যোগাযোগ করতে পারে।
৫. **মনোযোগ:** জন্মের পর শিশু মায়ের মুখের দিকে তাকায়, খেলতে খেলতেই শিশু আর্কষণীয় জিনিসের প্রতি, উচ্চ শব্দ, চলমান জিনিসের প্রতি মনোযোগী হয়। অর্থাৎ শিশুর মনোযোগের পরিসর বাড়ে।
৬. **বোধশক্তি:** মনোযোগ সহকারে দেখা, শোনার ফলে শিশু বিষয়টি বুঝতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধারণার পরিসর বাড়ে।
৭. **শব্দহীন যোগাযোগ/দেহভঙ্গি:** শুরুতে কান্নার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ শুরু হয়-মা শিশুর কান্নায় সাড়া দেন। এই যোগাযোগ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে আরও পরিশীলিত করে শিশু যোগাযোগ করে।
৮. **কথা:** সবশেষে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী পন্থায় অর্থাৎ কথার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে শেখে।

যোগাযোগ শিশুকে বন্ধুদের সাথে, পরিবারে কার্যকরী আন্তঃসম্পর্ক তৈরিতে এবং জীবনকে সহজ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

অংশ-খ | ভাষা শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপাদান

বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো শিশু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। ভাষা শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় উত্তরণের উপাদানগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

বুদ্ধি: বুদ্ধির সঙ্গে ভাষা শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সব বুদ্ধিমান শিশুই যে তাড়াতাড়ি কথা শিখতে পারে তা নাও হতে পারে, তবে যেসব শিশু তাড়াতাড়ি কথা শিখে তারা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়।

১) **স্বাস্থ্য:** দুর্বল স্বাস্থ্যের শিশুরা সাধারণত দেরিতে কথা শিখে, তাদের কথা বলার স্পৃহাও কম থাকে। তদুপরি দুর্বল শিশুদের পিতা-মাতারা তাদের সমস্ত দরকার আগে থেকেই পূরণ করে থাকেন বলে শিশুদের কথা বলার দরকার কম হয় এবং তাদের কথা বলতে বিলম্ব হয়। বধিরতা এবং ধীর শ্রবণশক্তিও শিশুদের কথা বলার অন্তরায় হয়।

২) **লিঙ্গ ভিন্নতা:** শৈশবে ছেলে শিশুরা ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে মেয়েদের থেকে অগ্রসর থাকে। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে এগিয়ে যায়।

৩) **সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ:** যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে শিশুর বয়োবৃদ্ধি ঘটে, তার প্রভাব শিশুর ভাষা বিকাশে ভুমিকা রাখে। উন্নত এবং মার্জিত পরিবেশে যেসব শিশু বেড়ে উঠে তাদের ভাষা উন্নত এবং মার্জিত হয়, শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুদের ভাষা অনুন্নত হয় কারণ তারা মার্জিত ভাষা ব্যবহার দেখে না।

৪) **পারিবারিক সম্পর্কঃ** নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক শিশুর ভাষা বিকাশে সহায়তা করে। শিশুরা যদি বাড়িতে কথা বলার উৎসাহ পায় ও স্বাধীনতা পায়, তার ভাষা শিক্ষার দ্রুত উন্নতি ঘটে।

৫) **দ্বিভাষাঃ** শিশুকে একই সময়ে দুটি ভাষা শিক্ষার প্রচেষ্টা শিশুর ভাষা শিক্ষার অন্তরায় হতে পারে। এমন যদি হয় শিশুর বাড়ির পরিবেশে যদি এক রকম ভাষা ব্যবহার হয় এবং বিদ্যালয়ে যদি অন্য ভাষা ব্যবহার হয় তবে শিশুর ভাষা শিক্ষার গতি ধীর হতে পারে। এজন্য এখন শিক্ষাবিদগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা শুরুর কথা বলছেন।

শিক্ষকের করণীয়ঃ

প্রচুর পরিমাণে খেলা, গল্প বলাসহ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজের বর্ণনার মাধ্যমে শিশুর কথা ও ভাষার বিকাশকে সহায়তা করা এবং ক্রমান্বয়ে জটিল ভাষার ব্যবহারে উৎসাহিত করা। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ভাষার বিকাশকে প্রভাবিত করে- সামর্থ্য, কারণ এবং সুযোগ। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উপযুক্ত পরিমাণ সামর্থ রয়েছে কি-না, কেন কথা বলবে? কথা বলার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কি-না? কথা বলার যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ রয়েছে কি-না? উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়েই শিক্ষককে সুনজর দিতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. মানবীয় বিকাশ-আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ, ২০১০
২. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) (২০২০) পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড) তথ্যপুস্তক, ময়মনসিংহ।

সহায়ক তথ্য-১১ শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	প্রাথমিক স্তরের শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ

এরিক এরিকসন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মানবজীবনের বিকাশকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য মনো-সামাজিক তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্বে তিনি সমগ্র মানবজীবনকে ৮টি স্তরে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি স্তরে কিংবা বয়সে বিকাশের প্রক্রিয়া এবং বিকাশের ফলাফল ব্যাখা করেছেন। এরিকসন বলেছেন, একজন ব্যক্তিকে জীবনভর বিকাশের এই ৮টি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং জৈবিক ও সামাজিক এই দুই ধরনের শক্তির সাথে সমঝোতা করে চলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক বছরের শিশুকে কোলে তুলে উপরে ছুঁড়ে মারলে সে খুব আনন্দ পায় এবং হাসে কারণ এই সময়ে শিশু সবার উপর আস্থা রাখতে পারে। এবং এই সময়েই শিশু চারপাশের জগতকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু শিশু যদি খেলতে খেলতে ব্যাথা পায় তাহলে তার মধ্যে চারপাশের জগত সম্পর্কে একটি অনাস্থা তৈরি হয় এবং এই অনাস্থার কারণে পরবর্তী খেলার সময় সে এক ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে। এই অনাস্থা নিয়ে সে যখন বিকাশের পরবর্তী ধাপে পদার্পণ করে তখন সে চারপাশের জগত সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এভাবে বিকাশের এক স্তরের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল অন্য স্তরকে প্রভাবিত করে।

এরিকসন প্রস্তাবিত মনো-সামাজিক বা সামাজিক-আবেগিক বিকাশের ০৮টি ধাপ হলো-

১। আস্থা বনাম অনাস্থা (Trust vs. Mistrust): ০-১ বছর
২। ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম লজ্জা ও সংশয় (Autonomy vs. Shame & Doubt): ১-৩ বছর
৩। কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt):৩-৬ বছর
৪। পরিশ্রম বনাম হীনম্মন্যতা (Industry vs. Inferiority): ৬-১২ বছর
৫। স্বকীয়তা বনাম দ্বিধা (Identity vs. Confusion): ১২-২০ বছর
৬। ঘনিষ্ঠতা বনাম বিচ্ছিন্নতা (Intimacy vs. Isolation): ২০-৪০ বছর
৭। উৎপাদনশীলতা বনাম স্থবিরতা (Generativity vs. Stagnation): ৪০-৬০ বছর
৮। সম্পূর্ণতা বনাম নিরাশা (Ego Integrity vs Dispair): ৬০ বছর+

যেহেতু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের বিকাশ প্রযোজ্য, আমরা এখানে এই দুই স্তরে শিশু যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে সে সম্পর্কে জানবো।

পর্যায়সমূহ	দ্বন্দ্ব	সন্তোষজনক ফলাফল	অসন্তোষজনক ফলাফল
৩-৬ বছর	কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ	নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শিখে এবং চারপাশের জগতকে নিয়ন্ত্রণ	শিশুর আচরণগুলো এই সময় মিনিংফুল বা অর্থপূর্ণ হয়। যদি

	(Initiative vs. Guilt)	করতে চায়। নতুন কাজ বা খেলার মাধ্যমে সবার আকর্ষণ পেতে চায়। কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ এসময়ই শিশুদের মধ্যে কোন কাজের উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়।	কোন শিশু অনেক বেশী চেষ্টা করেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোন খেলা বা নতুন কোন কাজের জন্য প্রশংসা বা সমর্থন না পায় তাহলে শিশুর মনে এক ধরনের অপরাধবোধ তৈরি হয়।
৬-১২ বছর	পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority)	শিশু এই সময়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং এই বয়সের বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ভূমিকা রাখেন।পরীক্ষা, ক্লাস পারফর্মেন্স, খেলাধুলা এসবের মাধ্যমে শিশু নিজেকে কর্মদক্ষ মনে করে।	যদি শিশু এই সময়ে স্কুলে পারফর্মেন্স খারাপ করে কিংবা ব্যর্থ হয়, এবং শিক্ষকগণ যদি সে কারণে শাস্তি দেয় বা সমালোচনা করেন তখন শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা বোধ তৈরি হয়।

অংশ-খ	শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষকের করণীয়

শিশুর সামাজিক -আবেগিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা:

এরিক এরিকসনের মনো-সামাজিক তত্ত্বের বিভিন্ন স্তরে শিশুর বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt) এবং পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority) এই দুটি স্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সাথে সম্পর্কিত। এ স্তরে শিশুর সামাজিক ও আবেগিক বিকাশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।এসময় প্রতিকূল পরিবেশ, খারাপ অভিজ্ঞতা, দারিদ্রতা তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা শিশুর সার্বিক বিকাশে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিচে প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

১. কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt)

বয়স: ৩-৬ বছর

এই স্তরে শিশুরা নতুন নতুন জিনিস শেখার চেষ্টা করে, কল্পনা শক্তি কাজে লাগায় এবং নতুন কাজ করার উদ্যোগ নেয়। যদি তাদের এ উদ্যোগকে দমন করা হয় বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়, তবে তারা অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করে।

এ স্তরের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

১. অভিভাবকদের অতিরিক্ত শাসন বা দমনমূলক আচরণ যা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ততা ও নতুন জিনিস শেখার ইচ্ছা দমিয়ে দেয়।
২. অবহেলা বা উপেক্ষা, এতে শিশু মনে করে তাদের কাজের কোনো মূল্য নেই, যা অপরাধবোধ তৈরি করে।
৩. খেলার সুযোগের অভাব। এতে শিশুরা সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ পায় না।

৪. অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপানো, এতে শিশুর ক্ষমতার বাইরে কাজ চাপিয়ে দিলে তারা ব্যর্থতার ভয়ে অপরাধবোধে ভোগে।

এ সকল প্রতিবন্ধকতার ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস কমে যায়, আবেগিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, নতুন উদ্যোগ নিতে ভয় পায়।

২. পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority)

বয়স: ৬-১২ বছর

এই স্তরে শিশুরা দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করে এবং স্কুল, বন্ধু, ও পরিবেশ থেকে সাফল্যের অনুভূতি পেতে চায়। যদি তারা বারবার ব্যর্থ হয় বা প্রশংসা না পায়, তবে হীনমন্যতার বোধ জন্মায়।

এ স্তরের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

১. স্কুলে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা: শিক্ষকের অবজ্ঞা বা সমর্থনের অভাব, সহপাঠীদের দ্বারা বুলিং।
২. পরিবারের উচ্চ প্রত্যাশা: পারফরম্যান্স নিয়ে অভিভাবকদের অতিরিক্ত চাপ।
৩. পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব: শেখার উপকরণ বা পরিবেশের অভাব।
৪. নিজেকে তুলনা করার প্রবণতা: শিশুরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়লে হীনমন্যতা অনুভব করে।
৫. শারীরিক বা মানসিক বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা: যেমন শারীরিক অসুস্থতা বা শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জ।

শিশুর সামাজিক আবেগিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের ভূমিকা:

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ এবং পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা- এই বৈশিষ্ট্যগুলি মাথায় রেখে শিক্ষক তার বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুর সামাজিক-আবেগিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারেন।

১. কর্মোদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (Initiative vs. Guilt):

১. উৎসাহ প্রদান: শিশু কোনো কাজ করতে চাইলে পারতপক্ষে সেটিতে বাঁধা না দিয়ে বরং উৎসাহ প্রদান করা। শিশুর প্রতিটি উদ্যোগের প্রশংসা করুন, যেমন তাদের আঁকা ছবি, গড়া খেলনা বা তাদের প্রশ্ন করা। "তুমি এটা করতে পারবে" বা "তোমার চেষ্টা ভালো লেগেছে" এরকম কথায় তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ান।
২. স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া: শিশুকে স্বাধীনভাবে নতুন কাজ করার সুযোগ দিন, যেমন নিজে গল্প বানানো বা ছোট দলগত খেলায় অংশগ্রহণ। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিন এবং ভুল করলে শাস্তি না দিয়ে শেখার সুযোগ দিন।
৩. নেতিবাচক সমালোচনা এড়িয়ে চলা: ভুল করলে শিশুদের ধমক না দিয়ে তাদের ভুল বোঝান। নেতিবাচক শব্দ যেমন "তুমি পারবে না" বা "তোমার কাজটা খারাপ হয়েছে" এড়িয়ে চলুন।
৪. সৃজনশীলতার বিকাশ: শিশুর সৃজনশীলতাকে উদ্দীপিত করতে শিল্পকর্ম, গান, নাচ বা নাটকের মতো কার্যক্রমের আয়োজন করুন।
৫. তুলনা না করা: এক শিশুর সাথে অন্য শিশুর তুলনা না করা।
৬. সহমর্মিতা ও সমর্থন: শিশুর আবেগ ও সমস্যাগুলো বুঝে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করুন।
৭. আত্মবিশ্বাস বাড়ানো: শিশুকে বিশ্বাস করান যে তারা যোগ্য এবং তাদের চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

২. পরিশ্রম বনাম হীনমন্যতা (Industry vs. Inferiority):

১. পরিশ্রমের স্বীকৃতি: শিশুর কাজকে গুরুত্ব দিন এবং তাদের পরিশ্রমের প্রশংসা করুন। প্রতিযোগিতার চেয়ে অংশগ্রহণকে বেশি গুরুত্ব দিন।শিশুর যেকোনো কাজ, সেটি যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তার প্রশংসা করা।

২. আগ্রহ অনুযায়ী কাজ: সকল শিশুর প্রতি সমান মনযোগ দিতে হবে। শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী তাকে তার পছন্দের কাজ করতে দেওয়া।

৩. ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি: শ্রেণিকক্ষে একটি সমতা এবং সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলুন। শিশুদের ভুল নিয়ে মজা না করে তাদের পাশে দাঁড়ান।

৪. তুলনার পরিবর্তে ব্যক্তিগত দক্ষতার মূল্যায়ন: এক শিশুর সঙ্গে আরেক শিশুর তুলনা না করে প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং দক্ষতাকে গুরুত্ব দিন। তাদের শক্তি ও দুর্বলতা বোঝার চেষ্টা করুন এবং সেই অনুযায়ী সমর্থন দিন।

৫. মিলিত কাজের সুযোগ: দলগত কাজের মাধ্যমে শিশুদের সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করুন। "টিম ওয়ার্ক" শেখানোর জন্য ছোট ছোট প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

৬. নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি: শিশুদের ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ দিন এবং তাদের নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করুন।কোনো শিশু নেতৃত্ব দিতে উৎসাহী হলে তাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করা।

৭. হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য: যারা হীনমন্যতায় ভুগছে তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলুন এবং তাদের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখতে শেখান। তাদের ব্যর্থতাকে শেখার অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরুন।

৮. মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি: শিশুদের এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রমে (গান, খেলাধুলা, অঙ্কন ইত্যাদি) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন। প্রতিটি শিশুর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভা বা আগ্রহ খুঁজে বের করুন এবং সেগুলো বিকাশে সহায়তা করুন।

তথ্যসূত্র:

১. দ্য ল্যানসেট সিরিজ-১, ২০০৭, DOI: 10.1016/S0140-6736(07)60076-2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17223478/

২. ব্রাক আইইডি, মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ সহায়িকা (অপ্রকাশিত)

৩. **ভিডিও লিংক** 8 stages of development by Erik Erikson

https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ&t=1s

সহায়ক তথ্য-১২	শিশুর আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশল ও আত্মপরিচর্যা

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. আবেগ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা ও নিজের আবেগসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. নিজেদের আবেগ ব্যবস্থাপনা ও আত্মপরিচর্যার কৌশলসমূহ ব্যাখা করতে পারবেন।

অংশ-ক	আবেগ-অনুভূতির ধারণা

আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা

- আমি নেতিবাচক অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তা অন্যকে বুঝতে দেয়া আমার দুর্বলতা প্রকাশ করে।
- নেতিবাচক অনুভূতি খারাপ এবং ধ্বংসাত্মক হয়।
- আবেগপ্রবণ হওয়া মানে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া।
- আবেগ কোন কারণ ছাড়াই অনুভূত হতে পারে।
- সকল বেদনাদায়ক আবেগই খারাপ মনোভাবের ফলাফল।
- অন্যরা যদি আমার আবেগ বুঝতে না পারে, তাহলে আমার মতে আবেগ অনুভব করা উচিত নয়।

অংশ-খ	আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

আবেগ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ:

- মননশীলতা এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস।
- আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করুন ।
- মানসিক চাপ হ্রাস করুন (পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, কাজের অগ্রাধিকার সেট করুন, নিজের এবং অন্যের জন্য সহমর্মিতা দেখান, মননশীল ক্রিয়াকলাপ করুন, সাহায্য নিন)।
- সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করুন।
- অন্যের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন।
- মানুষের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন।
- ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখার অনুশীলন করুন।
- আত্ম-সচেতনতার অনুশীলন করুন।
- নিজের আবেগ অনুভূতিগুলো পর্যবেক্ষণ করুন।

আত্মপরিচর্যা:

আত্মপরিচর্যার অর্থ হলো নিজের জন্য কিছু করা। কিছু সময় বের করে নিজের জন্য অর্থপূর্ণ কিছু করাকেই আত্মপরিচর্যা বলে। আমরা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে নিজেদের ইচ্ছায় ও উদ্যোগ নিয়ে নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার নাম হলো আত্নপরিচর্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আত্মপরিচর্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে

বলেছে, 'নিজের যত্ন হলো ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায়ের সেই সক্ষমতা যা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াই স্বাস্থ্যের উন্নয়নে, রোগ প্রতিরোধে, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে, অসুস্থতা ও অক্ষমতার সাথে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।'

আত্মপরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা:

- **জীবনের সন্তুষ্টি বাড়ানো:** আত্মপরিচর্যা ব্যক্তির জীবনে আনন্দদায়ক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তির জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় ও জীবনমান উন্নত হয়। আর নিজে সন্তুষ্ট থাকলে সে অন্যদের সাথেও ভালোভাবে মিশতে পারে এবং যেকোনো কাজ আরো দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম হয়।
- **অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা:** আত্মপরিচর্যার একটি লক্ষ্য হচ্ছে নিজের জন্য অনিষ্টকর বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখা। অনেক সময় আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে এমন কিছু ব্যক্তি থাকে, যারা আমাদের অবমূল্যায়ন করে কিংবা যাদের উপস্থিতিতে আমরা অস্বস্তিবোধ করি বা খারাপ অনুভব করি। আত্মপরিচর্যার মাধ্যমে ব্যক্তি এ ধরনের খারাপ লাগাকে কাটিয়ে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- **শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতা নিশ্চিত করা:** যখন আমরা নিজের প্রতি যত্ন নেই তখন নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা এসবের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। নিজেকে একটু সময় দিয়ে নিজের মনের মতো কোনো কাজ করে আমরা আমাদের মনকে ভালো রাখতে পারি আর মন ভালো থাকলে আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
- **মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা:** দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকি। যখন চাপের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন চাপ মোকাবিলা করতে করতে এমন এক পর্যায় যেয়ে পৌঁছাই যে সামান্য চাপও আমরা আর মোকাবিলা করতে পারি না। এরকম পরিস্থিতিতে নিয়মিত নিজের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ, অস্থিরতা, ভয়, আশঙ্কা, মন খারাপ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুভূতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।
- **কর্ম দক্ষতা বাড়ানো:** যখন আমরা নিজে ভালো থাকি তখন আমরা আমাদের কাজগুলো আরও বেশি দক্ষতার সাথে করতে পারি।
- **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** নিয়মিত নিজের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা আরও বেশি সচেতন হতে পারি। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম, স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ইত্যাদি আমাদের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তা তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে এবং চিকিৎসা নিতেও সাহায্য করে। এছাড়া শরীর ভালো থাকলে তা মন ভালো রাখতে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

মনের যত্নে আত্ম-পরিচর্যামূলক অনুশীলন শুরু করার ধাপসমূহ-

- কী অর্জন করতে চাই তা চিহ্নিতকরণ।
- যেসব ব্যক্তি বা বিষয় বর্জন করতে হবে তার তালিকা তৈরি ।

- কাজে চাপ কমানো ও নিজেকে আনন্দ দেওয়ার সুযোগ প্রদান।
- নিজের মনের কথা শোনা ও প্রতিটি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের মাঝে আত্ম-পরিচর্যার সুযোগ খোঁজা।
- সফলভাবে একটি কাজ করতে পারলে নিজেকে প্রশংসা করা।

মনের যত্নে আত্ম-পরিচর্যার উপায়সমূহ -

আত্ম-পরিচর্যামূলক কাজসমূহ নানাভাবে করা সম্ভব। এধরনের কিছু কাজের উদাহরণ হলো:

- পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও পর্যাপ্ত ঘুম এগুলো নিজের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।
- প্রতিদিন কিছু সময় ব্যায়াম করা অথবা হাঁটা।
- কাজের ফাঁকে অল্প সময়ের জন্য হলেও বিশ্রাম নেয়া।
- কাছের কোন বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রিয় মানুষের সাথে সময় কাটানো, নিজের মনের কথা শেয়ার করা।
- নিজেই নিজের প্রশংসা করা, নিজেকে বাহবা দেওয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করা।
- অল্প পরিসরে নিজের পছন্দের কোন কাজ করা, যেমন- বই পড়া, গান শোনা, নাটক বা সিনেমা দেখা বা ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- রিল্যাক্সেশন/শিথিলায়ন অনুশীলন করা।

আত্ম-পরিচর্যায় মাইন্ডফুলনেস -

মাইন্ডফুলনেস হলো বর্তমানের প্রতি পুরোপুরি সচেতন থাকা, আমরা কোথায় আছি, কী করছি সে সম্পর্কে সচেতনতা। মাইন্ডফুলনেস অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের শারীরিক, আবেগীয় ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও সচল রাখতে পারি। আমরা যদি প্রতিদিন ২/৩ বার করে এই অনুশীলন করি তবে তা আমাদের বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করবে এবং মনকেও ভালো রাখবে।

মাইন্ডফুলনেস অনুশীলন -

- প্রথমে আরাম করে বসে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করুন। (আপনি চাইলে চোখ খোলা রেখেও অনুশীলনটি করতে পারেন) এরপর শ্বাসের দিকে গভীর মনোযোগ দিন। নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নিন, এরপর মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। এভাবে কয়েকবার শ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন।
- মনে করুন- আপনি যখন শ্বাস নিচ্ছেন তখন ঠান্ডা সুবাতাস আপনার নাক দিয়ে ঢুকে পেট পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। আপনি যখন শ্বাস ছাড়ছেন, তখন আপনার সব দুঃখ-কষ্ট, টেনশন, কাজের চাপ, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা শ্বাসের সাথে বের হয়ে যাচ্ছে। আপনার অনেক আরাম লাগছে।
- মনে করুন- আপনি একটি বাগানে নরম সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। নরম সবুজ ঘাসের কোমল স্পর্শ আপনি আপনার পায়ে অনুভব করছেন। মৃদু ঠান্ডা বাতাস আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। আপনার অনেক শান্তি লাগছে। বাগানে ফুটে আছে আপনার পছন্দের সব ফুল। বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আপনার অনেক ভালো লাগছে। আপনার চারিদিকে অনেক পাখি, পাখির কিচির-মিচির শুনতে পাচ্ছেন। আপনার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এবার এই সুন্দর পরিবেশে আরও কিছুটা সময় নিয়ে ভালো লাগা এবং প্রশান্তি অনুভব করুন। আরও কিছুটা সময় নিজের সাথে কাটান। এরপর এই ভালো লাগা এবং প্রশান্তি সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে সেশনে ফিরে আসুন এবং চোখ খুলুন।

পেশি শিথিলায়ন খেলার (Progressive Muscular Relaxation) নিয়মাবলিঃ

এক বনে এক বদরাগী বাঘ ছিল। তার অত্যাচারে বনের সকল পশুপাখি অতিষ্ঠ ছিল। সবাই মিলে একটা মিটিং এ বসল। সবাই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিয়াল পণ্ডিতের কাছে গেল এর সমাধানের জন্য। কারণ শিয়াল ছিল বনের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কোন সমস্যায় পড়লে শিয়াল সমাধান দেয়। সবকিছু শুনে শিয়াল তাদের আশ্বস্ত করল সে বিষয়টা দেখবে কিভাবে বাঘের রাগ কমানো যায়।

শিয়াল বাঘের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখে একটা বুলবুলি পাখি হঠাৎ করে বাঘের সামনে দিয়ে উড়ে চলে যাওয়ায় কিছু বালি বাঘের চোখে যায়, এতে বাঘ রাগে ইইইইইইইইই করতে থাকে (আমরা সবাই এমন করে অভিনয় করি)।

শিয়াল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শিয়ালকে দেখে বাঘ একটু শান্ত হল। অন্য সবার মতো বাঘেরও শিয়ালকে ভীষণ পছন্দ, তার উপর আস্থা ছিল যে সে তার রাগ কমাতে পারবে। বাঘ শিয়ালকে বলে ভাগ্নে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে কিছু একটা করো আমার জন্যে।

শিয়াল: বাঘ মামা আমি বুঝতে পারছি তোমার অনেক রাগ হচ্ছে এবং তোমার রাগ হওয়াটাও এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত। একটা উপায় আছে তোমার রাগ কমানোর সেটা হল মাংসপেশী শিথিল এর অনুশীলন।

বাঘ: জলদি বল আমাকে কি করতে হবে তার জন্যে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এই পুঁচকে পাখিটার এত বড় সাহস আমার চোখে বালি দিয়ে উড়ে গেছে।

শিয়াল: চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে লম্বা করে দম নিয়ে মনে মনে ১-৩ পর্যন্ত গণনা হলে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেই। এভাবে তিন বার করে করি।

- এবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করি একটা দুষ্টু পাজি মাছি এসে আমার কপালে বসেছে। মাছিটাকে হাত না লাগিয়ে তাড়াতে হবে, কপাল কুঁচকে মাছিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে কপাল শিথিল করব। এবার সেই মাছিটা এসে নাকের উপর বসেছে। এবারো মাছিটাকে হাত না দিয়ে নাক কুঁচকে তাড়িয়ে দিব।
- এরপর আমরা আড়মোড়া ভাঙার মতো করে হাত দুটোকে এমনভাবে উপরের দিকে টান টান করে তুলব যেন মনে হয় আমি গাছের একদম উপরের ডাল ধরছি। এবার ধীরে ধীরে হাত নামাই।
- এবার আমাদের ডান হাতটা উপর দিকে তুলে মনে করি আমাদের ডান হাতে একটি লেবু রয়েছে। ডান হাত দিয়ে লেবুটাকে চিপে লেবুর রসটা বের করি, ১-২, ১-২, ১-২। ডান হাত নামাই। এবার বাম হাতটা উপর দিকে তুলে ধরে একইভাবে বাম হাত দিয়ে লেবুর রস বের করি ১-২, ১-২, ১-২। এবার আমরা দুই হাত উপরের দিকে তুলে ধরি এবং দুই হাত দিয়ে লেবুর রস বের করি ১-২, ১-২, ১-২।
- আমরা তো কচ্ছপ দেখেছি, তাই না? কচ্ছপের মাথায় টোকা দিলে কচ্ছপ মাথাটাকে ভেতরের দিকে নিয়ে যায়। আমরা একসাথে দুই ঘাড়কে উপরে নিচে নামিয়ে কচ্ছপের মত করি ১-২, ১-২,

১-২।

- এবার কল্পনা করি আমাদের সামনে একটি অদৃশ্য দেয়াল রয়েছে, সেই দেয়ালটাকে আমরা সবাই মিলে সামনের দিকে ধাক্কা দিব। কিন্তু আমরা নিজেদের জায়গা থেকে নাড়াচাড়া করব না বা পড়ে যাব না। আমরা এখন একসাথে সজোরে ধাক্কা দেই দেয়ালকে। (ইয়াআআআআআআআ)
- এখন আমরা বিভিন্নভাবে হাসব। প্রথমে হাহা করে সবাই হাসি। এরপর হো হো করে হাসি। এবার হিহি করে হাসি।
- এবার কল্পনা করি আমরা বনে আরাম করে শুয়ে আছি, আর একটি হাতি আসছে আমাদের দিকে। কিন্তু আমাদের উঠতে মন চাচ্ছে না। আমরা আমাদের পেটটা এমনভাবে শক্ত করে গুটিয়ে শুয়ে থাকি যাতে আমাদের না দেখা যায়। এভাবে কিছুক্ষণ থাকি। হাতি আমাদেরকে না দেখেই চলে গেল।
- এবার মনে করি আমাদের পায়ে কাদা মাটি লেগেছে। এবার আমরা পা থেকে কাদামাটি ছাড়ানোর চেষ্টা করি পায়ের আঙ্গুলগুলো নাড়াচাড়া করে।

শিয়াল: মামা কেমন লাগলো?

বাঘ: আমার তো অনেক আরাম লেগেছে। মনে হচ্ছে রাগ অনেকটাই কমে গিয়েছে।

শিয়াল: মামা তুমি এই ব্যায়াম নিয়মিত করবে, তাহলে দেখবে তুমি মানসিক চাপ বা রাগের সময় শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

তথ্যসূত্র:

মেহ্জাবীন হক (২০১৪) কৈশোরের যতকথা বালুকণা থেকে মুক্তা| জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ রাউফুন নাহার (২০২০) মনের যত্ন। অনিন্দ্য প্রকাশ

সহায়ক তথ্য-১৩ শিশুর শিখন ও বিকাশে খেলার গুরুত্ব

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখনে খেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. খেলার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-খ	**খেলা ও শিশুর শিখন ও বিকাশে খেলার গুরুত্ব**

সকল শিশুর জন্য খেলাধুলা একটি সহজাত বিষয়। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের সকল শিশুই কমবেশি খেলাধুলা করে। একটি শিশুর উপযুক্ত বিকাশ ও প্রাপ্ত বয়সের সাফল্যে শিশুকালের খেলাধুলার ভূমিকা রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, খেলা হলো শিশুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমষ্টি যেখানে শিশুরা স্বেচ্ছায় আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। খেলার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে জন্মগত। খেলার মধ্য দিয়েই শিশুর সমস্ত প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়। খেলার মাধ্যমে শিশুরা নিজের, তাদের চারপাশের মানুষ ও পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারে।

খেলার বৈশিষ্ট্যসমূহ-

- ✓ **খেলা সহজাতঃ** খেলা একটি সহজাত বিষয়। শিশু তার নিজের মধ্যেই খেলার অনুপ্রেরণা অনুভব করে এবং খেলায় নিয়োজিত হয়। খেলায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে শিশুর কাছে খেলা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- ✓ **খেলা প্রতীকী ধরনের হতে পারেঃ** খেলা প্রতীকী ধরনের হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা মিছেমিছি খেলা করে। যেমন-তারা রান্না রান্না খেলে কিংবা বাক্সর মধ্যে বসে নৌকা চালানোর ভঙ্গি করে ইত্যাদি।
- ✓ **শিশুরাই খেলার নিয়ম ঠিক করেঃ** শিশুদের অনেক খেলার লিখিত নিয়মকানুন থাকলেও অনেক সময়ই দেখা যায় শিশুরা যখন খেলা করে তখন এর নিয়মকানুন তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়।
- ✓ **খেলা প্রক্রিয়া নির্ভর, ফলাফল নির্ভর নয়ঃ** শিশুদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, খেলাতে প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। ফলাফলের গুরুত্ব এখানে কম।
- ✓ **খেলা আনন্দময়ঃ** খেলা সবসময়ই ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা মনের আবেগ, অনুভূতি, ভাবের প্রকাশ করতে পারে।

শিশুর বিকাশে বিভিন্ন ধরণের খেলা: শিশুর সামগ্রিক বিকাশে বিভিন্ন ধরনের খেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বয়সের বিভিন্ন ধাপে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন খেলার প্রবণতা রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে গবেষকরা খেলাকে নানা ভাগে ভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে একই ধরনের খেলাকে আবার বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন নাটকীয় খেলাকে কেউ কেউ সামাজিক নাটকীয় খেলা, ফ্যান্টাসি খেলা, রোল প্লে ইত্যাদি নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এখানে কয়েক ধরণের খেলা আলোচনা করা হয়েছে যা বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

সংবেদনশীল/ ইন্দ্রিয়র খেলা (Sensory Play):সংবেদনশীল খেলা হলো এমন ধরণের খেলা যা শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় ও উদ্দীপিত করে। সাধারণত খুব অল্প বয়স থেকে শিশুরা এ ধরনের খেলা শুরু করে। যেমন- একটি ছোট শিশু তার আঙুল মুখে দেওয়া, কোনো কিছু ধরা বা স্পর্শ করা বা কোনো কিছুর দিকে তাকানো ইত্যাদি। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে খুব ছোট শিশুরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের (স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণ, শ্রবণ, দেখা এবং গন্ধ) মাধ্যমে তাদের চারপাশের পরিবেশকে অনুধাবন করে, যোগাযোগ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।

একাকী খেলা (Solitary Play): একাকী খেলার ক্ষেত্রে শিশু স্বাধীনভাবে একা একা খেলা করে। যেমন পুতুল, গাড়ি, ব্লক ইত্যাদি নিয়ে একজন শিশু একাকী বা অন্য শিশুদের থেকে আলাদা হয়ে এককভাবে নিজের মতো করে খেলা করে। সাধারণত ০ থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে একাকী খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অন্য শিশুদের সাথে সমন্বয় করা বা অন্যকে সাথে নেবার প্রবণতা বা কারো সাথে আলোচনা করার প্রবণতা থাকে না।

শারীরিক খেলা (Pshysical Play): সাধারণত ২ বছর বয়স থেকে শিশুদের এই ধরনের খেলা খেলতে দেখা যায়। এই খেলা শিশুর সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশির গঠনে, হাত ও চোখের সমন্বয় এবং শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাতের কব্জি, আঙুল, পায়ের পাতা, পায়ের আঙুল, জিহ্বা, ঠোঁট ইত্যাদি ব্যবহার করে শিশুরা যে ধরনের খেলা করে তাতে সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বাড়ে। যেমন- শিশু তার মা-বাবার হাতের আঙুল ধরে নাড়াচাড়া করে খেলা করে, আঙুলের সাহায্যে ছোটো ছোটো জিনিস ধরে খেলা করে, চামচ ধরে খেলা করে ইত্যাদি। হাত, পা এবং শরীর ব্যবহার করে বসতে পারা, হাঁটা, দৌড়ানো, ইত্যাদির নড়াচড়ার ফলে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা করে শিশুরা যে ধরনের খেলা করে তাতে স্থুলপেশীর দক্ষতা বাড়ে। যেমন, লাফানোর পর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা, বল ছুঁড়ে খেলা করা ইত্যাদি।

প্রতীকী খেলা (Symbolic Play):সাধারণত ১৮ মাস থেকে শিশুর মধ্যে এই ধরনের খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের খেলায় শিশুরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস, কাজ বা ধারণাকে নিজের ইচ্ছামতো রূপান্তর করে খেলা করে থাকে। যেমন- কোনো খালি বাক্স বা ব্লককে মোবাইল বানিয়ে, বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে বা নিজের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে ইচ্ছামতো খেলে থাকে। প্রতীকী খেলা শিশুর ভাষার দক্ষতা অর্জনে, সামাজিক ও আবেগিয় শিখন, কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে।

গঠনমূলক খেলা (Constructive Play): গঠনমূলক খেলা সাধারণত ২ বছর বয়স থেকে দেখা যায়, তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এর প্রবণতা বাড়তে থাকে। শিশু নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে যা কিছু তৈরি করে

এরূপ খেলাকেই গঠনমূলক খেলা বলে। এ ধরনের খেলাতে একটি গঠনমূলক চিন্তা বা পরিকল্পনা থাকে। শিশু একক বা দলে চিন্তার সমন্বয়ে খেলা করে থাকে। যেমন ব্লক দিয়ে ঘরবাড়ি, গেট বা পুল বানানো ইত্যাদি।

নাটকীয় খেলা (Dramatic Play): সাধারণত তিন বছর বয়সের কাছাকাছি থেকে শুরু হয় করে শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং চারপাশের পরিবেশকে অনুকরণ করার প্রবণতা গড়ে উঠে। এ সময় শিশুরা নাটকীয় খেলায় আগ্রহী হয়ে উঠে। এ ধরনের খেলায় কোনো বিষয় নিয়ে শিশুরা একা বা সাথীদের সাথে অভিনয় করে খেলা করে। শিশুরা তাদের দেখা পূর্বের কোনো ঘটনা বা বিষয়ের অনুরূপ কিছু অভিনয় করে এই খেলা করে থাকে। কোনো একটা কিছুকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে বা কোনো একটি চরিত্রে অভিনয় করে শিশুরা নাটকীয় খেলা খেলে থাকে। যেমন- রান্না করা, ব্লককে গাড়ি হিসেবে চালানো, ডাক্তার হয়ে চিকিৎসা করা, শিক্ষকের মতো করে পড়ানো, গৃহস্থালি কাজ করা ইত্যাদি।

সহযোগিতামূলক খেলা (Co-operative Play): সাধারণত ৪ বছর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে এই খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন পিকনিক খেলা, কানামাছি খেলা, হাঁড়িপাতিল খেলা, পুতুলের বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের খেলায় একটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে শিশুরা সহযোগিতার ভিত্তিতে দল তৈরি করে খেলা করে। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশুরা অনেক জটিল সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করে। যেমন- খেলায় নিজেদের ভূমিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা, দায়িত্ব ভাগাভাগি করা, দায়িত্ব পালন ও খেলা আয়োজনের মতো বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করে। এই ধরনের খেলার মাধ্যমে শিশুরা নেতৃত্ব দেওয়া এবং নেতাকে অনুসরণ করার গুনাবলি অর্জন চর্চা করে।

নিয়মমাফিক খেলা (Games with rules): সাধারণত সাত বছর বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে নিয়মমাফিক খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রতিযোগিতামূলক খেলা যেখানে উদ্দেশ্য পূর্ব নির্ধারিত থাকে। যেমন- বরফ-পানি, কানামাছি, ফুল টোঁকা ইত্যাদি।

<u>শিশুর প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের ক্ষেত্রে (ELDS) খেলার গুরুত্ব:</u>

খেলা শিশুর সামগ্রিক বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক, ভাষাগত, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি মাধ্যম। এখানে শিশুর বিকাশের ৪টি প্রধান ক্ষেত্রের আলোকে শিখনে খেলার গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা বিকাশে খেলার গুরুত্ব:

- পেশীজ দক্ষতার উন্নয়ন: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুর স্থুল (gross motor) পেশী যেমন হাত-পা এবং সুক্ষ্ম (fine motor) পেশী যেমন আঙুলের কার্যক্ষমতা উন্নত হয় ও শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।
- শারীরিক স্বাস্থ্য: খেলার মাধ্যমে শিশুরা সক্রিয় থাকে, যা তাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি এবং শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।
- সমন্বয় দক্ষতা: চোখ-হাত বা দেহের বিভিন্ন অংশের সমন্বয় কাজ করতে পারা খেলার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

উদাহরণ:

- বল নিক্ষেপ, লাফানো, দড়ি লাফানো ইত্যাদি খেলা শিশুর শারীরিক বিকাশে সহায়ক।
- হাতের কাজের খেলা (যেমন: আঁকা, মাটি দিয়ে কিছু তৈরি করা) সুক্ষ্ম পেশির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

২. সামাজিক ও আবেগিক বিকাশে খেলার গুরুত্বঃ

- সহযোগিতা ও দলগত কাজ: দলবদ্ধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা একসাথে কাজ করা, সহযোগিতা করা এবং একে অপরকে সাহায্য করতে শেখে।
- সম্পর্ক স্থাপন: খেলার মাধ্যমে শিশুরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে শেখে।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ: খেলাধুলা শিশুদের রাগ, হতাশা, আনন্দ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়।
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: খেলার সময় অর্জিত সফলতা শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: খেলাধুলার সময় শিশুরা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধান করতে শেখে।
- সৃজনশীলতা: ভূমিকা নির্ভর খেলা (role-play) বা কল্পনার খেলা শিশুর সৃজনশীলতা বাড়ায়।
- মনোযোগ বৃদ্ধি: খেলা শিশুদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে শেখায়।
- সহযোগিতা ও দলগত কাজ: দলবদ্ধ খেলা শিশুকে সহযোগিতা, ভাগাভাগি এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়।
- নেতৃত্ব এবং অনুসরণ: খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু নেতৃত্বের গুণাবলী এবং অন্যের নেতৃত্ব মেনে নিতে শেখে।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণ: খেলার মাধ্যমে শিশুরা তাদের রাগ, হতাশা, আনন্দ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।
- আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: নতুন দক্ষতা অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- ঝুঁকি নিতে শেখা: খেলার মাধ্যমে শিশুরা ঝুঁকি নিতে শিখে। এর ফলে পরবর্তী জীবনে শিশু ব্যাক্তিগত ও সামাজিকভাবে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে

উদাহরণ:

- দলগত খেলা যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট দলগত কাজ ও নেতৃত্ব শেখায়।
- ভূমিকা নির্ভর খেলা (role-play) শিশুকে আবেগ প্রকাশ ও মেনে নিতে সাহায্য করে।

৩. ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশে খেলার গুরুত্বঃ

- ভাষাগত দক্ষতা: খেলার সময় শিশুরা নতুন শব্দ শিখে এবং তাদের কথা বলার দক্ষতা উন্নত করে। গল্প বলার খেলা বা ভূমিকা পালন খেলার মাধ্যমে শিশুদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- শ্রবণ ও বোঝার ক্ষমতা: খেলার নির্দেশাবলী অনুসরণ করার মাধ্যমে শিশুর শ্রবণ এবং অনুধাবনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- যোগাযোগ দক্ষতা: শিশুদের খেলার মাধ্যমে কিভাবে প্রশ্ন করতে, নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে, এবং অন্যদের কথা শুনতে হয় তা শেখানো যায়। একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে।

উদাহরণ:

- গল্প বলার খেলা বা পুতুলের মাধ্যমে কল্পনার খেলা ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- দলগত খেলায় পরস্পরের সাথে আলোচনা করা বা পরিকল্পনা করার মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ে।

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে খেলার গুরুত্ব:

- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা: খেলার সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে শিশুরা সমস্যার সমাধান করতে শেখে।
- সৃজনশীলতা ও কল্পনা: সৃজনশীল খেলার মাধ্যমে শিশু কল্পনা এবং নতুন ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়।
- মনে রাখার ক্ষমতা: খেলাধুলার নিয়ম বা কৌশল শেখার মাধ্যমে শিশুর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- একাগ্রতা: খেলার মাধ্যমে শিশুরা মনোযোগ ধরে রাখতে শেখে।
- শিক্ষামূলক ধারণা: রং, সংখ্যা, বর্ণ, এবং আকার শেখানোর জন্য খেলা একটি কার্যকর পদ্ধতি।
- ধৈর্য এবং সময় ব্যবস্াপনা: খেলার মাধ্যমে শিশুরা ধৈর্যশীল হতে এবং সময় ব্যবস্থাপনা করতে শেখে।
  উদাহরণ:

- পাজল সমাধান করা বা লেগো গেম শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা উন্নত করে।
- রং এবং আকারের খেলা শিশুকে ধারণা এবং তুলনা করতে শেখায়।

শিশুর শিখনে খেলার ভূমিকা:

- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তীক, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশ হয়।
- খেলা ভিত্তিক শিখন গতানুগতিক শিখনের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হয়। যেমন- খেলা শিশুদের কাছে শিখনের অনেক বড় সুযোগ তৈরি করে। খেলার মাধ্যমে শিশুদের আত্মসম্মান বোধ তৈরি হয় এবং শিশু সফলতার দিকে অগ্রসর হয়।
- খেলা শিশুর সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে উন্নত করে।
- খেলার মাধ্যমে শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক এবং সামাজিক বিকাশ হয়।
- খেলার মাধ্যমে শিশু সমস্যা সমাধান, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকা ও শেয়ার করা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিরোধ নিস্পত্তি করতে শেখে।
- সর্বোপরি, খেলার মধ্য দিয়ে শিশু কিছু শিখলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অংশ- খ	**খেলার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন**

শিশুর বিকাশ চারটি প্রধান ক্ষেত্রে ঘটে: শারীরিক ও পেশির কার্যক্ষমতা বিকাশ, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ, ভাষা ও যোগাযোগের বিকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এই ক্ষেত্রগুলোর প্রতিটিতে খেলার ভূমিকা অপরিসীম এবং সঠিক খেলার পরিবেশ তৈরি এবং নির্দেশনা প্রদান করে শিক্ষক শিশুর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা রাখতে পারেন। খেলার মাধ্যমে শিশু তাদের পরিবেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে শিখে, যা তাদের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য ভিত্তি তৈরি করে।

শিক্ষকের করণীয়ঃ

শিক্ষকদের ভূমিকা খেলার মাধ্যমে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ।

১। শারীরিক বিকাশে সহায়তা করাঃ

- শিশুদের জন্য শারীরিক খেলার ব্যবস্থা করা (যেমনঃ বল খেলা, দোলনা, দড়ি লাফানো)।
- শিশুদের সক্রিয় খেলায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- শারীরিক সীমাবদ্ধতা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের খেলার ব্যবস্থা করা।

২. উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করাঃ

- শিশুদের খেলার জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- খেলার জন্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন বল, পাজল, পুতুল, রং ইত্যাদি সরবরাহ করা।
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে শিশু খেলার সময় আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

৩. খেলার মাধ্যমে শেখার পরিকল্পনাঃ

- শিক্ষাক্রম অনুযায়ী খেলা ভিত্তিক কার্যক্রম তৈরি করা। উদাহরণঃ সংখ্যা শেখানোর জন্য ব্লক ব্যবহার করা।
- শিক্ষণমূলক খেলার আয়োজন করা (যেমনঃ অক্ষর বা সংখ্যার গেম)।
- শিশুদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করতে উৎসাহিত করা।
- শিশুদের খেলার মাধ্যমে নতুন ধারণা শেখানো (যেমনঃ রং, আকার, গণনা)।
- ভূমিকা নির্ভর খেলার (role play) ব্যবস্থা করা যেখানে শিশুরা বাস্তব জীবনের কাজ বা চরিত্র অনুকরণ করতে পারে।

৪. শিশুদের পর্যবেক্ষণ করাঃ

- খেলার সময় শিশুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের চাহিদা ও সমস্যাগুলি বোঝা।
- শিশুদের শক্তি এবং দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম তৈরি করা।

৫. দিকনির্দেশনা দেওয়াঃ

- শিশুদের খেলার সময় প্রয়োজনে সহায়তা করা এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা। উদাহরণঃ যদি কোনো শিশু খেলায় অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করে, তাকে উৎসাহিত করা।

৬. শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়াঃ

- শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলার সুযোগ দেওয়া যাতে তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী শিখতে পারে।
- অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করা।

৭. অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগঃ

- অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে শিশুদের শেখার জন্য ঘরে খেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা।
- পিতামাতাকে খেলার মাধ্যমে শিক্ষার কৌশল শেখানো।

৮। সামাজিকীকরণে সহায়তা করাঃ

- দলগত খেলার আয়োজন করা (যেমন: ক্রিকেট, ফুটবল বা বোর্ড গেম)।
- শিশুদের মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝানো এবং তাদের দলবদ্ধ কাজে উৎসাহিত করা।
- সামাজিক আচরণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান দেওয়া।
- ঝগড়া বা মতভেদ হলে শান্তিপূর্ণ সমাধান শেখানো।

৯। শিশুদের আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করাঃ

- শিশুদের উৎসাহিত করা যাতে তারা খেলায় অংশ নিয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে।
- শিশুর আবেগ বুঝে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা।
- প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমে শিশুকে জয় এবং পরাজয় দুটোই মেনে নিতে শেখানো।
- যে কোনো নেতিবাচক আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা এবং ইতিবাচক আচরণে

খেলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশকে গতিশীল করা সম্ভব। শিক্ষককে এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে, যেমন উপযুক্ত খেলার পরিকল্পনা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং শিশুদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

তথ্যসূত্রঃ

১। আকতার, ফ. (২০১৭). "শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলার ভূমিকা।" বাংলাদেশ শিক্ষা গবেষণা জার্নাল, খণ্ড ২৩, পৃষ্ঠা ৫৬-৬২।
২। 'শিশুর বিকাশ ও খেলাভিত্তিক শিখন' বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সহায়িকা, (জানুয়ারি ২০২৩); ডিপিই, প্রাগম, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
৩। চৌধুরী, এম. ক. (২০১৯). " শিক্ষা ও খেলার মাধ্যমে শিশুর বিকাশের কৌশল।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা, খণ্ড ৩৫, পৃষ্ঠা ৪৫-৫০।
৪। রহমান, স. (২০২০). "শিশু বিকাশ ও শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি।" জাতীয় শিক্ষা একাডেমি প্রকাশনা, ঢাকা।
ইসলাম, জ. (২০১৮). "খেলার মাধ্যমে শিশুদের শেখার প্রভাব।" প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন বার্তা, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩০-৩৮

সহায়ক তথ্য-১৪	শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী শিখন আচরণে করণীয়

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;

খ. শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরণ অনুযায়ী শিখন আচরণ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিখন আচরণ অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

ঘ. শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধারণা ও ধরণ

বুদ্ধিমত্তাঃ

বুদ্ধিমত্তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যক্তির যুক্তি, বোধ, আত্মসচেতনতা, শিখন, আবেগিক জ্ঞান, যৌক্তিকতা, পরিকল্পনা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধিমত্তাকে আরও বিস্তৃত করে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে তথ্য বুঝতে পারার ক্ষমতা ও তা জ্ঞান হিসেবে ধারণ এবং পরবর্তীতে পরিবেশ অথবা অবস্থা অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। David Wechsler (১৯৯৪) বুদ্ধিমত্তাকে ব্যক্তির আপন পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা এবং কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করাকে বুঝিয়েছেন।

যে সকল প্রভাবক শিক্ষা গ্রহণকে প্রভাবিত করে, তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগের সক্ষমতা। শিক্ষা, পেশা, সমাজে খাপ খাইয়ে চলাসহ সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার ধারণা বিস্তৃত।

সুতরাং বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা, বিভিন্ন বস্তু এবং পদ্ধতির মাঝে সম্পর্ক অনুধাবন করা, সমস্যা সমাধান করতে পারা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারা, স্বল্প সময়ে অধিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা, নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য।

বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য

বুদ্ধিমত্তার মূল বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল-

১. এটি শিশুর স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

২. শিশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারবে।

৩. শিশু তার পূর্বের অভিজ্ঞতা হতে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. শিশু নিয়ম মেনে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়।

৫. সে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে।

৬. জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে।

৭. ছেলে এবং মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।

৮. ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তায় স্বতন্ত্র পার্থক্য দেখা যায়।

৯. বুদ্ধিমত্তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু এর উন্নতির জন্য সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজন।

গার্ডনারের মাল্টিপল ইন্টিলিজেন্স (Multiple Intelligences) থিওরি বা বহুমাত্রিক বুদ্ধিমত্তা-

হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার ১১ জুলাই, ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন আমেরিকান ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলোজিস্ট। ১৯৮৩ সালে হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার তার বই " ফ্রেমস অফ মাইন্ড" এ প্রথম "একাধিক বুদ্ধিমাত্রার তত্ত্ব (Theory of Multiple Intelligences)" উপস্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে ৭টি বুদ্ধিমত্তা অন্যতম। যেমন-

১. **ভাষাবৃত্তিক বুদ্ধিমত্তা (Linguistic Intelligence):** যে শিশুর ভাষাগত বুদ্ধি প্রখর, সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ছড়া,গান করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

২. **যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা (Logical-Mathematical Intelligence):** যে শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর, সে তার বয়স উপযোগী গাণিতিক জটিলতাগুলো সহজে বুঝতে পারে এবং সমাধান করতে পারে।

৩.**দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা (Spatial-Visual Intelligence)**ঃ কোনো শিশুর মধ্যে দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা থাকলে সে সহজে বিভিন্ন অবস্থান বিষয়ক নিদর্শনা বুঝতে পারে যেমন - বইটি টেবিলের উপর রেখে আসো, একটি পুতুল কোনো বইয়ের পাশে রেখে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে পুতুলটি কিসের পাশে ইত্যাদি। আরও দেখা গেছে এই শিশুরা ছবি, আকার-আকৃতি ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

৪.**শরীরবৃত্তিক বুদ্ধিমত্তা (Bodily-Kinesthetic Intelligence)**ঃ যে শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা প্রখর সে ভালো নাচতে পারে, হাত-পা নাড়িয়ে ব্যায়াম করতে পারে, দৌড়াতে পারে এবং বিভিন্ন শারীরিক খেলাধূলায় পারদর্শী হয়।

৫.**ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা (Musical Intelligence)**ঃ শিশুর মধ্যে ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি প্রখর হলে সে সুর ও ছন্দ ঠিক রেখে ভালো গান গাইতে পারে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে।

৬.**অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Intrapersonal Intelligence)**ঃ যে শিশুর মধ্যে অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে, সে নিজের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন শিশুরা যে কাজ ভালো পারে তা সে বারবার করতে চায়, সবাইকে দেখাতে চায়।

৭.**আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা (Interpersonal Intelligence)**ঃ যে শিশুর মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে সে অন্যদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। সমবয়সী, ছোট বা বড়দের সাথে মিশতে পারে এবং মিলেমিশে খেলা করতে পারে।

উপরে উল্লিখিত intelligence ছাড়াও হাওয়ার্ড আর্ল গার্ডনার আরও তিনটি Intelligence এর কথা বলেছেন, যেমন- Naturalistic, Existential and digital intelligences. উপরের

সাতটি Intelligence সহজে পরিমাপ করা যায়, আমরা সহজে এগুলো বুঝতে পারি তাই এগুলো নিয়েই আলোচনা করা হলো।

শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণঃ

শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শিখন আচরণ চিহ্নিত করতে পারেন। কারণ শিক্ষক সবচেয়ে বেশি সময় শিশুদেরকে শিখন পরিবেশে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান এবং তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা রাখেন। এখানে শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণের ধারণা দেওয়া হলো-

- কিছু শিশু আছে তারা শুনে শুনে ভালো শিখতে পারে। শিক্ষক যা বলেন এবং যেভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা পাঠ সম্পর্কে যা বলে শিশু সেখান থেকে ভালো করে শিখে। একই পড়া শিক্ষার্থী বার বার শুনতে চায়।

- যেসব শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর তাদের বয়স উপযোগী গাণিতিক সমস্যা নিজে নিজে সমাধান করতে পছন্দ করে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের এই শিখন ধরন শিক্ষক সনাক্ত করতে পারেন।

- কোনো কোনো শিশু দেখে শিখতে বেশি আগ্রহী হয় বা দেখে শিখলে বেশি মনোযোগ দেয়। তাদের আসলে দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি থাকে।

- যেসব শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা ভালো তারা কোনো কিছু করার মাধ্যমে ভালো শিখে। যেমন- নেচে, হাত পা ব্যবহার করে বা শারীরিক চলাচলের মাধ্যমে।

- আবার কিছু ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি প্রখর থাকে। ছন্দময় কিছু থাকলে তারা দ্রুত শিখে নিতে পারে।

- যে শিশুর মধ্যে অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা থাকে তারা একা একা কাজ করতে পছন্দ করে এবং এভাবে ভালো শিখে।
- কিছু শিশু থাকে যারা সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পছন্দ করে আবার সবার সঙ্গে একসঙ্গে শিখতেও পছন্দ করে। তাদের যোগাযোগ দক্ষতা হয় খুব ভালো। এসব শিশুর মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল।

শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন অনুযায়ী শিখন আচরণ অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকাঃ

শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শিখন আচরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী তাদের শিখনের জন্য যেমন একটি পাঠপরিকল্পনা করতে পারেন যেখানে সব ধরনের বুদ্ধিমত্তার শিশু শেখার সুযোগ পায়।

- যেসব শিশু শুনে শুনে ভাল শিখতে পারে তাদের জন্য শিক্ষক পাঠ ভালো করে ব্যাখ্যা করলে এবং সেইসব শিক্ষার্থীদের বেশি বলার সুযোগ দিলে তাদের শিখন ভালো হবে।
- যেসব শিশুর যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রখর সেসব শিশুদের জন্য শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যা দিতে পারেন এবং কিছু নতুন গাণিতিক সমস্যা তৈরি করে দিতে পারেন। অনেক সময় তাদেরকে অনুশীলনীর সমস্যা সমাধান করতে দিতে পারেন।
- শিক্ষক যখন পাঠপরিকল্পনা করেন, তখন যেসব শিশু কিছু দেখে ভালো শিখে তাদের কথা মাথায় রেখে

পাঠে কিছু ভিজ্যুয়াল উপকরণ রাখতে পারেন। যখন শ্রেণিতে দলীয় কাজ দিবেন, তখন তাদের জন্য ভিজ্যুয়াল উপকরণ রাখবেন এবং তাদেরকে ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহার এবং তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন। শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে কিছু দেখিয়ে শেখানো তাদের জন্য ভালো হয়।

- যেসব শিশুর শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা ভালো শিক্ষক তাদের পাঠ পরিকল্পনায় এমন কিছু রাখবেন যেখানে শিশুদের হাত পা বা কিছুটা চলচলের মাধ্যমে পাঠে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। যেমন - কিছু অভিনয় করে দেখানো বা পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু তৈরি করা।

- ছোট শ্রেণিতে শিক্ষক ছড়া, গান ইত্যাদি ব্যবহার করে শিশুদের সহজে শেখাতে পারেন। তুলনামূলক বড় শ্রেণিতে কিছু কিছু পাঠে বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক এভাবে শেখার সুযোগ রাখতে পারেন। এতে করে যেসব শিশুর ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধি থাকে তারা দ্রুত শিখে।
- শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এসব শিশুদের অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে বুঝতে পারেন এবং তাদের জন্য একা একা পড়ার সুযোগ দিতে পারেন। যেমন- কোন কিছু ব্যাখ্যা করা বা নিজে কিছু করে অন্যদের দেখানো।
- শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা চিহ্নিত করতে পারেন এবং এসব শিশুদের জন্য বেশি বেশি দলীয় কাজের বা দলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এতে করে তাদের শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে। এসব শিশুরা যদি সুযোগ পায় তবে তাদের সহপাঠীদের কোন কিছু বুঝিয়ে দিতে আনন্দ পায়।

অংশ-খ	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার উপাদান

পারিবারিক সংস্কৃতিঃ

নিচের বিষয়গুলোর কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায়? যেমন-

- আমার পরিবার কোন জিনিসটি মূল্য দিয়ে থাকে এবং কীভাবে তারা আচরণ করে?
- আমার পারিবারিক রুটিন ও প্রিয় কাজগুলো কী কী?
- পরিবারের সবাই অবসর কীভাবে কাটায়?
- ঘুম ও খাওয়ার সাধারণ রুটিন, আমরা যে খাবারগুলো খাই?
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করি?
- যে গানগুলো আমরা শুনে থাকি ইত্যাদি।

সামাজিক শ্রেণিঃ

আমি এবং আমার পরিবারের সদস্যরা নিজেদেরকে কোন শ্রেণির বলে মনে করি? কেন?

উদাহরণস্বরূপ- মধ্যবিত্ত লোকেরা সময়কে কঠোরভাবে গুরুত্ব দেয় এবং কিছু মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অপরদিকে দরিদ্র এবং ধনী লোকেরা এক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় হয়ে থাকেন।

বয়স/বিকাশের ধরনঃ

বিকাশের ভিন্নতার কারণে অনেক সময় শিশু তার বয়সের চেয়ে বেশি পরিণত বা সক্ষম হয়, আবার অনেক সময় বয়সের তুলনায় কম পরিণত হয়। ব্যক্তির বয়স তার বিশ্বাস এবং কার্যকলাপ প্রভাবিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ পাঁচ বছর বয়সি শিশুরা বেশিক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে, আরও স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে পারে, আরও বেশি কিছুতে নিযুক্ত হতে পারে। অন্যদিকে তিন বছরের শিশুরা ততটা পারে না। তবে জন্মের পরে পুষ্টি ও এক একটি কাজের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনা মস্তিষ্কের কোষগুলোকে সংযোজিত হতে সহায়তা করে। শিশুকে যে কাজের জন্য যতবেশি উদ্দীপনা দেওয়া হবে সে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোষের সংযোগ ততবেশি হবে এবং শিশু সে কাজে ততবেশি পারদর্শী হবে।

ব্যক্তিত্ব এবং মেজাজ (Temperment) ঃ

ব্যক্তিত্বের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে মেজাজও বোঝা যায়। শিশুরাও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো-

চঞ্চল ↔ শান্ত

উদ্যমী ↔ ধীর গতির

কৌতুহলী ↔ উদাসীন

গ্রহণকারী ↔ সতর্ক

উদ্বিগ্ন ↔ শান্ত

শেখার ধরন বা শিখন পদ্ধতিঃ

আমি কী দেখে শিখতে পছন্দ করি নাকি শুনে বা হাতে-কলমে কাজ করে? আবার আমি কি খেলার মাধ্যমে মজা করে শিখতে পছন্দ করি নাকি দেখে শুনে দুটোকে মিলিয়ে শিখতে পছন্দ করি? শেখার ভিন্ন ধরনের কারণেও শিশুদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

আগ্রহঃ

আমার শখ কী কী?

আমি যদি এই মুহূর্তে নতুন কিছু শিখতে পারি তবে তা কী হবে?

শিশুর আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হলে তা শিখন ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়। তাই একজন শিক্ষক শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা তৈরি করতে পারেন যেমন- ভাষা, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ

১. Hanson, K.A., Kaufmann, R.K., & Saifer, S. (1996).Education and the culture of democracy: Early childhood practice. New York, NY:Open Society Institute.

২. Gardner, H. (2011). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books.)

৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (দ্বিতীয় খন্ড)

সহায়ক তথ্য-১৫ শিশুর বৈচিত্র্যময় শিখন চ্যালেঞ্জ

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় শিখন চ্যালেঞ্জ এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় শিখন চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় শিখন চ্যালেঞ্জ

একই কাজ সবাই সমানভাবে করতে পারে না। কেউ অনায়াসে করে ফেলে, কারো বেশি সময় লাগে, কারো জন্য তা শ্রমসাধ্য। কেউ হয়তো কোনো সহায়তা ছাড়াই কাজটি করে ফেলতে পারে আবার কেউ হয়তো অল্প সহায়তা পেলে কাজটি শেষ করতে পারে, কারো বা অন্যদের চেয়ে বেশি সহায়তা লাগে । প্রতি ক্লাসেই এ রকম বৈচিত্র্যময় সামর্থের শিক্ষার্থী থাকে, সেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকুক বা না থাকুক। একটি দল থাকে, যারা নির্দেশনা অনুযায়ী নিজ থেকে কাজ করতে পারে। অন্য দল থাকে, যাদের কাজ করতে অল্প সাহায্য লাগে এবং অপর দলের আরেকটু বেশি সাহায্য বা নির্দেশনা লাগে।

সব শিক্ষার্থীকে যখন শুধু একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়, অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। প্রত্যেক মানুষই ভিন্ন এবং সবার সামর্থ্যকে একই নিয়মে মাপা যায় না। আপাতভাবে যারা কোনো কিছু কম পারে বা পারে না বলে ধরে নেওয়া হয়, তাদের নিজস্ব সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সময়ের সঙ্গে অগ্রগতির হার পরিমাপ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে তারা অন্যদের চেয়ে খুব বেশি পিছিয়ে নেই, এমনকি হতে পারে তারা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

শিশুর উপযোগী শিখন পরিবেশ, শিখন-শেখানো কৌশল ও শিক্ষাপোকরণ না থাকার ফলে যেকোনো শিক্ষার্থীই তার সামর্থ্য অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। শিক্ষার্থীর কোনো চিহ্নিত প্রতিবন্ধিতা না থাকলেও উপযুক্ত শিখন পরিবেশের অভাবে তারা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে:

- মৌখিক উপায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগত চ্যালেঞ্জ
- একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ
- খেলাধুলায় সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে অনাগ্রহ প্রকাশ করা
- প্রত্যাশিত সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা চ্যালেঞ্জ
- বয়স উপযোগী দৈনন্দিন জীবন দক্ষতা (যেমন: নিজে নিজে টয়লেট ব্যবহার, জামা-জুতা ব্যবহার, খাবার গ্রহণ ইত্যাদি) অর্জনে চ্যালেঞ্জ
- পেশিগত বিকাশে চ্যালেঞ্জ (যেমন-হামাগুঁড়ি দেওয়া, হাঁটা, দৌঁড়ানো ইত্যাদি)
- আবেগ প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- মনোযোগ ধরে রাখতে চ্যালেঞ্জ
- তুলনামূলক জটিল বা সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি নিবিড় মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- শ্রবণ সংবেদনশীলতা বা শ্রবণে চ্যালেঞ্জ থাকায় শ্রেণি কার্যক্রমে অমনোযোগিতা

- নির্দেশনা (মৌখিক/লিখিত/ইশারা) অনুসরণে চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দুই বা ততোধিক ধাপযুক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- গুছিয়ে কাজ করতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়
- বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সামাজিক পরিসরে তিন ক্ষেত্রেই হাইপার এক্টিভ থাকা
- দীর্ঘ সময়ের জন্য এক জায়গায় না বসতে চাওয়া বা ছোটাছুটি করা
- বয়স অনুযায়ী বিকাশের মাইলফলক অর্জনে প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগে
- ভাষাগত বিকাশে চ্যালেঞ্জ এবং এ কারণে বুদ্ধিগত বিকাশেও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে
- অন্যের কথার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- সীমিত শব্দভাণ্ডার অথবা শব্দের সঠিক ব্যবহার (শব্দ তৈরি ও উচ্চারণ) করতে চ্যালেঞ্জ
- পেছন থেকে আসা শব্দ শোনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ
- বাধাহীনভাবে কথা বলায় চ্যালেঞ্জ (যেমন: তোতলামো)
- কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শব্দ সাজিয়ে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলায় চ্যালেঞ্জ
- শিক্ষা উপকরণ ধরতে চ্যালেঞ্জ
- হাতে-কলমে কাজ করতে চ্যালেঞ্জ
- অনিয়ন্ত্রিত পেশি সঞ্চালনা
- দৃষ্টি ও পেশির সমন্বয়ে চ্যালেঞ্জ
- শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে চ্যালেঞ্জ

অংশ-খ	**শিখন চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণে শিক্ষকের করণীয়**

কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকা মানেই ঐ ব্যক্তি অসুস্থ নয়। যেকোনো মানুষের মতোই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন তা হলো:

১. **মনোযোগ ধরে রাখায় চ্যালেঞ্জ:** কাজে মনোযোগ দেওয়া, কাজ শেষ করা, সময়মতো কাজ জমা দেওয়া, এক জায়গায় স্থিরভাবে থাকতে পারা ইত্যাদি কাজে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি না।

২. **পড়াশোনায় নেতিবাচক পরিবর্তন:** শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার পরও শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় অপ্রত্যাশিত অবনতি হচ্ছে কি না।

৩. **সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ:** সহপাঠী, সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সী শিশু, পরিবারের সদস্য, বয়োজ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা বা ধরে রাখা বা এড়িয়ে যাবার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি না।

৪. **আচরণগত চ্যালেঞ্জ:** আক্রমণাত্মক আচরণ করা, আকস্মিকভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া, নির্দেশনা এড়িয়ে চলা বা নির্দেশনা না বোঝা, শ্রেণিকক্ষের কাজে অনাগ্রহ, বিদ্যালয়ের বা সামাজিক নিয়মনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে কি না।

৫. **শারীরিক চ্যালেঞ্জঃ** দূরের বা কাছের জিনিস দেখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, স্বাভাবিক শব্দ শোনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, শব্দের ব্যাপারে সংবেদনশীলতা, পেশি সঞ্চালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, শারীরিক চলাচলে সীমাবদ্ধতা বা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি না।

কখন অভিভাবককে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের (চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, থেরাপিস্ট) সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেবেনঃ

- পরিবারের সদস্যগণ শিক্ষার্থীর আচরণে ওপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর যেকোনোটি একটানা চার সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন।
- ওই নির্দিষ্ট আচরণ বা বৈশিষ্ট্যটি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে (খাওয়া, ঘুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পর্যাপ্ত প্রচেষ্টার পরও শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় অপ্রত্যাশিত অবণতি হচ্ছে।
- পরিবারের সদস্য, শিক্ষক, সহপাঠী ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক মানুষের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে।
- আচরণটি শিক্ষার্থীর কোনো সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা বা সামাজিক, আবেগিক, অর্থনৈতিক টানাপড়েন অর্থাৎ কোনো বিচ্ছিন্ন কারণে হচ্ছে না।

তথ্যসূত্র:

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।

২। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।

সহায়ক তথ্য-১৬	শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন

অংশ-ক	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর বৈচিত্র্যময় আচরণ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন, তাই তাদের আচরণেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এর পেছনে রয়েছে আবেগ প্রকাশ, যোগাযোগ করার উপায়, এবং ব্যক্তি হিসেবে ভিন্নতার পাশাপাশি পরিবেশগত অনেক কারণ। কিছু কিছু আচরণ থাকে যেগুলো শিক্ষার্থীর নিজের ও অন্যের সার্বিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তাই, শিক্ষার্থীদের আচরণিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন আনাটা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যে ধরনের কাজ বা আচরণ করে সেগুলোকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে:

প্রত্যাশিত আচরণ: যে কাজগুলো শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাধা নয় বরং সহায়ক।

শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে এমন আচরণ: যে কাজগুলো শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিখনের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করে।

শিক্ষার্থী যখন প্রত্যাশিত আচরণ করে তখন তা এমনভাবে **রিইনফোসমেন্ট*** করতে হয় যেন সে এবং অন্যরা পরবর্তী সময়েও একই আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে, যে আচরণগুলো শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে সেগুলোকে এমনভাবে রিইনফোর্স করতে হয় যেন শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত উপায়ে আচরণ করতে শিখে। এ কারণে শিক্ষার্থীর কোন আচরণটি প্রত্যাশিত এবং কোনটি শিখনের জন্য বাধা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী রিইনফোর্স করতে পারা শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অংশ-খ	শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণের কারণ

ব্যক্তিগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক আচরণকেই শ্রেণিকাজের জন্য বাধা মনে হতে পারে। তবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো আচরণকে বাধা হিসেবে আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। বিষয়গুলো হলো:

- এমন আচরণ যা তার নিজের এবং অন্য শিক্ষার্থীদের শিখনে বাধা দেয়।
- এমন আচরণ যা তার নিজের বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর।
- এমন আচরণ যা বিদ্যালয়ের/শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দেয়।
- এমন আচরণ যার তীব্রতা, ধারাবাহিকতা ও সময়কাল শ্রেণিকক্ষের/বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।
- এমন আচরণ যা বিদ্যালয়/শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যাঘাত ঘটায়।

শিখনে আচরণ বিশ্লেষণের গুরুত্ব :

শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল এবং নির্দেশনার উপায় নির্ধারণ করার জন্য আচরণটি শনাক্ত করার পাশাপাশি একে বিশ্লেষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়:

- আচরণটি ঘটার আগের অবস্থা (Antecedent) কেমন ছিল?
- আচরণে (Behavior) কী কী ঘটে?
- আচরণটি ঘটার পরে (Consequences) কী হয়?
- আচরণটির উদ্দেশ্য (Function) কী ছিল?

যখন কোনো অপ্রত্যাশিত আচরণের উদ্দেশ্য জানা যায়, তখন এ ধরনের আচরণের পরিবর্তে কীভাবে প্রত্যাশিত উপায়ে একই উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় তা শেখানো সহজ হয়। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী যদি বারবার সীট থেকে উঠে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে, তাহলে সে আচরণের বিকল্প হিসেবে তাকে দিয়ে ক্লাসের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিতরণ করানো যেতে পারে। আচরণ বিশে-ষণ না করে শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে এমন আচরণ নিরসনের চেষ্টা করা হলে দীর্ঘমেয়াদে তা কার্যকর হয় না।

'এবিসি' মডেল অনুযায়ী আচরণ বিশ্লেষণ:

শিক্ষার্থীর আচরণ শনাক্ত করার পর, আচরণটির কারণ ও উদ্দেশ্য জানার জন্য শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। 'এবিসি' মডেল (ABC Model)-এর সাহায্যে আচরণটি ঘটার ঠিক আগে ও পরে কী হয় সে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে, আচরণটির কারণ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করাও সহজ হয় যা আচরণ পরিবর্তন-পরিমার্জন কৌশল নির্ধারণের জন্য আবশ্যক।

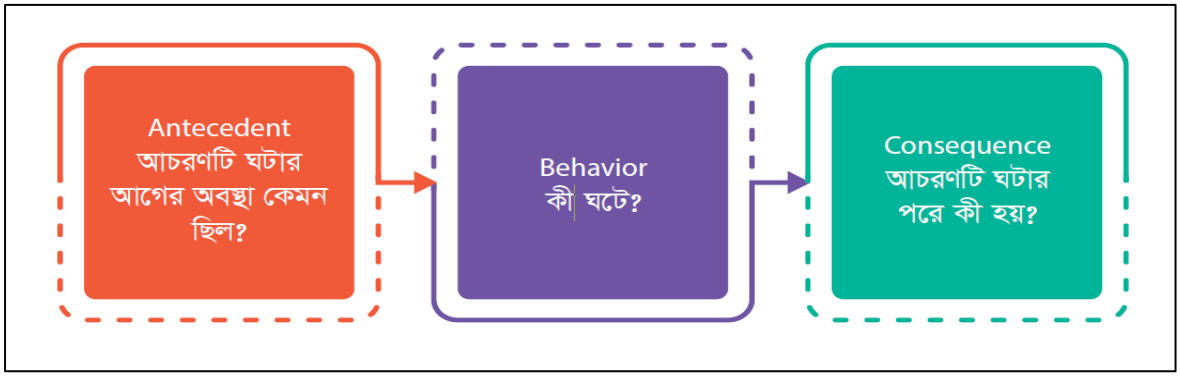

'এবিসি' (ABC) মডেল অনুযায়ী:

ক) আচরণ ঘটার পূর্বাবস্থা (Antecedent) হচ্ছে কোনো একটি আচরণ ঘটার ঠিক আগে কী ঘটে, কোন পরিবেশে, কোন সময়ে, কাদের উপস্থিতিতে ঘটে এবং শিক্ষার্থী ও অন্যরা কী বলেছে এবং করেছে এসব অবস্থাকে নির্দেশ করে। অবস্থাটি হতে পারে, কোনো কাজ করার নির্দেশনা দেওয়ার সময়, এক কাজ শেষ করে অন্য কাজে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্লাসের সময় ও কিছু নির্দিষ্ট মানুষের উপস্থিতি ইত্যাদি। এ ছাড়া আচরণটি ঘটার ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় কিছু পরিবর্তন বা চাহিদাও আচরণে প্রভাব রাখে। যেমন, শিক্ষার্থীর ক্লান্ড় লাগা, ক্ষিদে পাওয়া, ঘুম পাওয়া, অতিরিক্ত শীত বা গরম লাগা, টয়লেট চেপে রাখা ইত্যাদি।

খ) আচরণ (Behavior) চিহ্নিত হওয়ার পর আচরণটি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য উপায়ে বর্ণনা করতে হবে। আচরণ করার আগের পরিস্থিতি কেমন ছিল, আচরণটি কীভাবে করছে, কাদের উপস্থিতিতে করছে, কতবার এবং কতক্ষণ ধরে হচ্ছে, আচরণ শেষে কী হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে।

গ) আচরণ ঘটার পরপরই যা ঘটে তা হল আচরণ পরবর্তী ফলাফল (Consequence)। যেমন শিক্ষার্থীর আচরণের পরে শিক্ষার্থী নিজে ও অন্যরা ওই আচরণের বিপরীতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে বা আচরণটি করে শিক্ষার্থী কী সুযোগ/সুবিধা পায় ইত্যাদি হল ওই আচরণের ফলাফল।

আচরণের উদ্দেশ্য (Function of Behavior):

যে কোনো আচরণের (প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত উভয়ই) পেছনেই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। আচরণটি করে শিক্ষার্থী কী কী সুবিধা পায় বা সে কী ধরনের চাহিদা পূরণ করতে চায় তা চিহ্নিত করার মাধ্যমে আচরণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।

** মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষার্থীর আচরণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করার অর্থ সেটিকে 'ভালো' বা 'খারাপ' এভাবে নির্ধারণ করা নয়।

আচরণের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে ৪টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে:

১. **এড়ানোর প্রবণতা** (Escape): অনেক সময় শিক্ষার্থী যখন কোনো কাজ, মানুষ বা পরিবেশ এড়াতে চায় তখন এ ধরনের আচরণ করে। কোনো কাজ তার কাছে কঠিন, দীর্ঘ বা একঘেয়ে লাগলে; যদি সে একা থাকতে চায় বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে অসুবিধা/অস্বস্তিকর অবস্থা এড়িয়ে যেতে চাইলে তার মধ্যে এড়ানোর প্রবনতা তৈরি হতে পারে। যেমন :

> একজন শিক্ষার্থীকে লিখতে বলা হলে, সে মাটিতে বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। শিক্ষক যখন তাকে বলে, 'তোমাকে কাজটি আর করতে হবে না', তা শুনেই শিক্ষার্থী কান্না থামিয়ে তার সিটে ফেরত আসে।

এ থেকে বোঝা যায় শিক্ষার্থী আসলে ওই কাজটি এড়িয়ে যেতে চেয়েছে।

২. **মনোযোগ আকর্ষণের প্রবণতা** (Attention): শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আলাদা করে মনোযোগ পাবার জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করে। এ আচরণটি প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত দুটিই হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা শুধু অপ্রত্যাশিত আচরণের মাধ্যমে মনোযোগ পেয়ে থাকে, যা তাদের পরবর্তী সময়েও একই অপ্রত্যাশিত আচরণটি করতে উৎসাহিত করে। যেমন :

কোনো একজন শিক্ষার্থীকে ছবি আঁকতে বলা হলে সে চিৎকার করে শিক্ষককে ডাকতে থাকে, 'স্যার, স্যার, এদিকে আসেন স্যার'। শিক্ষক দ্রুত তার কাছে এলে সে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলা শুরু করে।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী এটা বুঝতে পারল যে চিৎকার-চেঁচামেচি করে শিক্ষকের মনোযোগ পাওয়া যায়।

৩. **বস্তুগত বা অবস্তুগত কিছু পাওয়ার জন্য** (Tangible/Intangible): অনেক সময় শিক্ষার্থী তখনই অপ্রত্যাশিত আচরণ করে, যখন সে কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত কিছু পেতে চায় বা এমন কোনো কিছু তার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এটি হতে পারে খেলনা, পছন্দের বস্তু, কাজ বা অনুভূতি, উপহার, খেলার সুযোগ, বিরতি ইত্যাদি। যেমন,

শিক্ষার্থী যখন টিফিন পিরিয়ডের আগেই টিফিন খাওয়ার চেষ্টা করে এবং তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন সে অন্য শিক্ষার্থীদের বিরক্ত করা শুরু করে। তখন শিক্ষক তাকে অর্ধেক টিফিন খাওয়ার অনুমতি দেয়। এ থেকে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে পরবর্তী সময়েও শিক্ষকের কাছে টিফিন খাওয়ার অনুমতি পেতে হলে অন্য সহপাঠীদের বিরক্ত করলেই হবে।

৪. **শারীরবৃত্তীয় অনুভূতি** (Sensory Experience): কখনো কখনো শিক্ষার্থীরা শারীরবৃত্তীয় অনুভূতি পাওয়ার জন্য কিছু স্ব-উদ্দীপনামূলক (self-stimulating) আচরণ করে থাকে। যেমন,

হাত-পা নাড়ানো, এপাশ-ওপাশ শরীর দোলানো, শরীর বা মাথা ঘোরানো, হাততালি দেওয়া, কাউকে জোরে চেপে ধরা, জড়িয়ে ধরতে চাওয়া, কোনো কিছু ধরে টানা হেঁচড়া করা, ওপরে-নিচে লাফানো ইত্যাদি।

এ ধরনের আচরণ শিক্ষার্থীরা অনেকসময় নিজেকে শান্ত রাখতে, ভালো বোধ করতে বা উত্তেজনা প্রকাশ করতে করে থাকে।

এ ছাড়া কিছু শারীরবৃত্তীয় অনুভূতি থাকতে পারে যেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে অসহনীয় লাগে বা কষ্টকর। যেমন, কিছু শিক্ষার্থী থাকতে পারে যাদের কাছে উচ্চ শব্দ, তীব্র আলো, আকস্মিক স্পর্শ, বিভিন্ন ধরনের গন্ধ ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপার অসহনীয় মনে হয়, যা কি না অন্য অনেকের কাছেই স্বাভাবিক বা সহ্য করার মতো। ওই সব নির্দিষ্ট ধরনের পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তারা যে ধরনের আচরণ করে তা অন্যদের কাছে নেতিবাচক মনে হতে পারে। যেমন, যাদের শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা আছে তারা জোরে শব্দ হলে দুহাত দিয়ে জোরে কান চেপে মাথা নাড়ানো শুরু করতে পারে, চিৎকার বা কান্না শুরু করতে পারে, ওই স্থান থেকে

ছুটে চলে যেতে চেষ্টা করতে পারে। আচরণের উদ্দেশ্য জানা না থাকলে তখন এ আচরণগুলো অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক বা শ্রেণিকাজের জন্য বাধা মনে হতে পারে।

যেকোনো মানুষই বিভিন্ন ধরনের স্ব-উদ্দীপনামূলক আচরণ করতে পারে, তবে সাধারণত স্নায়বিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের এ ধরনের স্ব-উদ্দীপনামূলক আচরণ বেশি করতে দেখা যায়। এ ধরনের আচরণ সহজে পরিবর্তন করা যায় না বা পরিবর্তন করতে দীর্ঘ সময় লাগে। তবে এ ক্ষেত্রে **মনে রাখা প্রয়োজন, স্ব-উদ্দীপনামূলক আচরণটি যতক্ষণ শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে এমন আচরণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ এটিকে অপ্রত্যাশিত আচরণ বলা যাবে না।** একই সঙ্গে কষ্টকর বা অসহনীয় শারীরবৃত্তীয় অনুভূতির কারণে অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটলে, আচরণ পরিবর্তন-পরিমার্জনের কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি যেসব কারণে (শব্দ, আলো, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি) ঘটে তা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।

রিইনফোর্সমেন্ট* (Reinforcemet-বলবর্ধক) কী?

কোন উদ্দীপক যদি একটি প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বা হার বৃদ্ধি করে তবে তাকে বলা হয় বলবর্ধক। অর্থাৎ প্রাণী পুরস্কারের লোভে সেটি বারবার করতে চায়। বলবর্ধন দু'ধরনের-

- ধনাত্মক বলবর্ধন (Positive Reinforcement): ধনাত্মক বলবর্ধন হলো এমন একটি শর্ত, যার উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট আচরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- ঋণাত্মক বলবর্ধন (Negative Reinforcement): ঋণাত্মক বলবর্ধন প্রাণীকে কোনো কাজ পুনরায় করতে নিরুৎসাহিত করে।

সহায়ক তথ্য-১৭	শিশুর আচরণ ব্যবস্থাপনা কৌশল

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিশুর শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ আচরণ নিরসনে বিভিন্ন কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. শিশুর আচরণগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে বর্জনীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিখনে আচরণগত চ্যালেঞ্জ নিরসনের কৌশল

রিইনফোর্সমেন্ট:

রিইনফোর্সমেন্ট হচ্ছে এমন কিছু কৌশল যেগুলো শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণকে উৎসাহিত করে এবং একই সঙ্গে শ্রেণিকাজের জন্য বাধা এমন আচরণকে প্রত্যাশিত আচরণে পরিবর্তন/পরিমার্জন (behavior modification) করতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থী যখন প্রত্যাশিত আচরণ করে তখন তা এমনভাবে রিইনফোর্স করতে হয় যেন সে এবং অন্যরা পরবর্তী সময়েও একই আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে, যে আচরণগুলো শ্রেণিকাজে বাধা তৈরি করে সেগুলোকে এমনভাবে রিইনফোর্স করতে হয় যেন শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত উপায়ে আচরণ করতে শিখে। এ কারণে শিক্ষার্থীর কোন আচরণটি প্রত্যাশিত এবং কোনটি শিখনের জন্য বাধা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী রিইনফোর্স করতে পারা শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

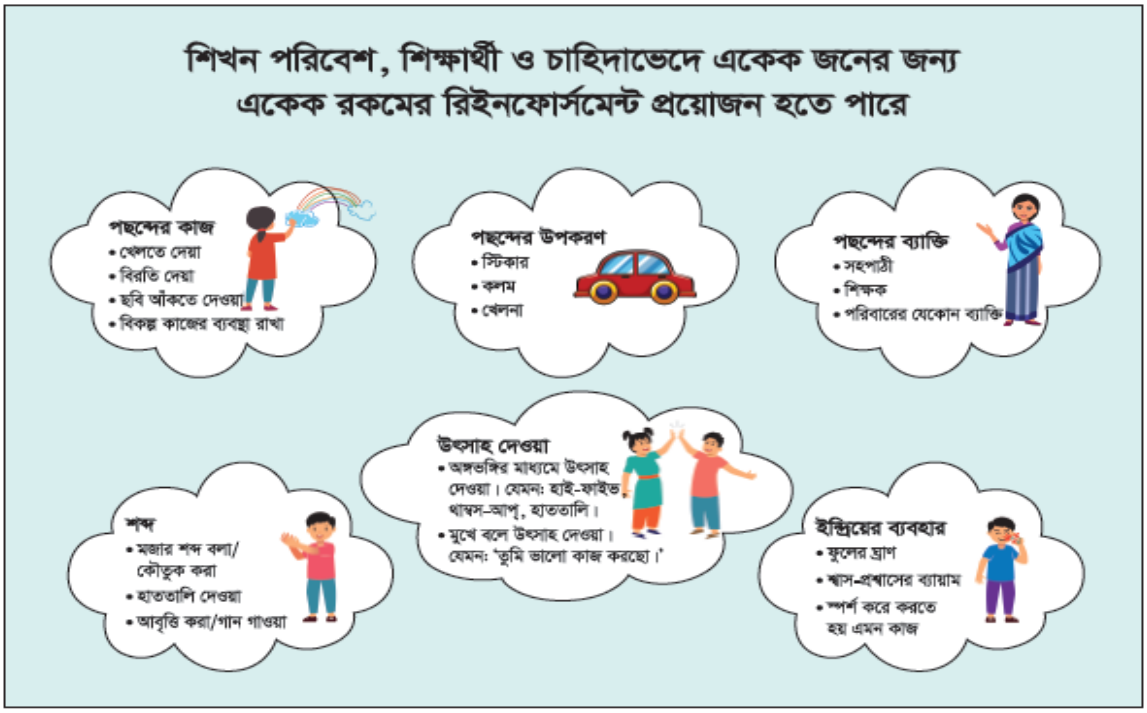

ছবি: ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রিইনফোর্সমেন্ট

নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা (Establishment of Rules):

শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে সেটি শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিবার সেই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করা। নিয়ম সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই হতে হবে। নিয়ম মনে করিয়ে দেবার কাজটিও আলাদাভাবে নির্দিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নয় বরং ক্লাসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে একসঙ্গে

মনে করিয়ে দিতে হবে। প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে তা মৌখিক, ছবি, ইশারা এবং পোস্টারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে যেন সব ধরনের শিক্ষার্থী নিয়মের বিষয়টি সমানভাবে বুঝতে পারে

প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো (Modeling):

শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে বা সামনে প্রত্যাশিত আচরণটি কেমন হবে শিক্ষক, সহপাঠী, ছবি, পোস্টার, ভিডিও বা অন্য যে কোন উপায়ে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যেন নির্দিষ্ট আচরণটি শিক্ষার্থী অনুকরণ করে প্রত্যাশিত আচরণটি করতে পারে।

প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise):

শিক্ষার্থী যখন কোনো প্রত্যাশিত আচরণ (অল্প সময়ের জন্য হলেও) করবে তখন তাকে মনোযোগ দেওয়া এবং আচরণটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা। কোনো শিক্ষার্থী যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে তখন অন্য যে শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণ করছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং কাজটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা। যাতে অপ্রত্যাশিত আচরণ করতে থাকা শিক্ষার্থী শুনতে পারে ও বুঝতে পারে প্রত্যাশিত উপায়ে কাজটি কীভাবে করতে হবে এবং এভাবে করলে শিক্ষকের প্রশংসা পাওয়া যায়।

অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore):

কোন শিক্ষার্থী যদি এমন আচরণ করে যেটি উপেক্ষা করে গেলে বা গুরুত্ব না দিলে শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন কোন প্রভাব পরবে না অথবা শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে থেকে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করবে তবে সেই আচরণ এড়িয়ে যাওয়া । শিক্ষকের মনোযোগ না পাওয়ার ফলে অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর অপ্রত্যাশিত আচরণ করার আগ্রহ কমে যায়।

প্রত্যাশিত আচরণের দিকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া (Redirect):

শিক্ষার্থী যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে তখন আচরণটির দিকে মনোযোগ না দিয়ে তার মনোযোগ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া । যেমন: কোনো ক্লাসের সময় যদি দুজন শিক্ষার্থী পাশাপাশি বসে লম্বা সময় ধরে কথা বলতে থাকে তবে শিক্ষক সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে অন্য কোন একটি কাজের সাধারণ নির্দেশনা (সবাই বাংলা বইয়ের ১০ নং পৃষ্ঠা খোল) দিবেন। এর ফলে তিনি সকল শিক্ষার্থীর মনোযোগ প্রত্যাশিত কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যত ধরনের বৈচিত্র্যময় আচরণ করে তার সবই বিশেণ্ডষণ করার বা সেগুলো নিয়ে আলাদা করে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র যে আচরণগুলো শিক্ষার্থীর নিজের ও অন্যদের সামগ্রিক বিকাশের বিঘ্ন ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি করে সেগুলো কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে:

১. আচরণ ঘটার পূর্বে
২. আচরণ ঘটার সময়ে
৩. আচরণ ঘটে যাওয়ার পরে

অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার পূর্বে যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে:

১। শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে সে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। নিয়ম সব শিক্ষার্থীদের জন্য একই হতে হবে।

২। অপ্রত্যাশিত আচরণ করার আগেই ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে প্রত্যাশিত আচরণ কেমন হবে তা দেখানো।

৩। প্রত্যাশিত আচরণ করলে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেওয়া (Reinforce appropriate behavior)

৪। ক্লাস চলাকালে কিছু সময় বিরতি দেওয়া।

৫। ক্লাস চলাকালে পছন্দের কাজ করতে দেওয়া।

***মনে রাখতে হবে :** ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক আচরণকেই শিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'প্রত্যাশিত আচরণ' হিসেবে নির্ধারণ করে রাখতে পারেন। তাই খেয়াল রাখতে হবে যেন এমন কোনো বিষয় 'প্রত্যাশিত আচরণ' হিসেবে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া হয় যা প্রকৃতপক্ষে তাদের শিখনে বাধা দেয়, তারা অপমানিত বোধ করে, তাদের আত্মমর্যাদা বা ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে, তাদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিত আচরণের ধারণা পরিবর্তন হয়।

যেমন, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল না হলে, শিক্ষার্থীকে দিয়ে তার অভিভাবককে ডেকে আনানো অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাছে প্রত্যাশিত আচরণ হলেও এখন আমরা জানি যে এ ধরনের বিষয় শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত অসম্মাজনক এবং তাদের মনোজগতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটার সময়ে যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে:

ক. অপ্রত্যাশিত আচরণ এড়িয়ে যাওয়া (Ignore) অনেক সময় একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে যদি আচরণটি শিক্ষার্থী বা অন্যদের জন্য সমস্যা তৈরি না করে।

খ. শিক্ষার্থী যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে তখন তার আচরণে মনোযোগ না দিয়ে তাকে নিজের কাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া (Redirect)। যেমন: ক্লাসের কাজের সময় ক্রমাগত কথা বললে, তার কথা বলা নিয়ে কিছু না বলে কাজের কথা মুখে বলে মনে করিয়ে দেওয়া।

গ. প্রত্যাশিত আচরণে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা (Praise)।

- শিক্ষার্থী যখন কোনো প্রত্যাশিত আচরণ (অল্প সময়ের জন্য হলেও) করবে তখনই তাকে মনোযোগ দেওয়া এবং প্রশংসা করা।
- কোনো শিক্ষার্থী যখন অপ্রত্যাশিত আচরণ করছে তখন অন্য যে শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণ করছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং কাজটি উল্লেখ করে প্রশংসা করা।

আচরণগত চ্যালেঞ্জ তীব্র পর্যায়ে পৌঁছালে:

- শিক্ষার্থী এ ধরনের আচরণ করলে তা ব্যক্তিগতভাবে নেয়া যাবে না।
- এ সময় শিক্ষকের শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে রাগ, উত্তেজনা বা বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না।
- নিজে শান্ত থাকবেন ও শিক্ষার্থীকে শান্ত হতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীকে নমনীয় কিন্তু দৃঢ় গলায় প্রত্যাশিত আচরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (Breathing exercise) করানোর মাধ্যমে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীর পাশে থেকে শান্ত স্বরে তাকে ব্যায়ামের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া শিক্ষক নির্দিষ্ট কিছু ছবি দেখিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের ধাপগুলো দেখিয়ে দিতে পারেন।

অপ্রত্যাশিত আচরণ ঘটে যাওয়ার পরে যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে :

ক. প্রত্যাশিত আচরণটি সবার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে জানানো। লক্ষ্য রাখতে হবে, নির্দেশনাটি যেন ওই এক/একাধিক শিক্ষার্থীকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে বলা না হয়।

খ. ছবির মাধ্যমে প্রত্যাশিত আচরণ দেখানো যেতে পারে।

অংশ-খ	শিখনে আচরণগত চ্যালেঞ্জ নিরসনে যে কাজগুলো করা যাবে না

- **শাস্তি :** শাস্তি শারীরিক ও মানসিক উভয় উপায়েই হয়। শাস্তি যে উপায়েই দেওয়া হোক না কেন, তা কখনোই একটি কার্যকর কৌশল নয়। কেননা, শাস্তি শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে অপ্রত্যাশিত আচরণ করা থেকে বিরত রাখলেও দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার্থী ও তার আশপাশের মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে। একই সঙ্গে, যারা শাস্তির শিকার হয় পরবর্তী বয়সে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্যদের সাথে তাদের আক্রমণাত্মক আচরণ করার সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পায়।
- **অন্যের সঙ্গে তুলনা করা :** কখনো কখনো শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে তাদের প্রত্যাশিত আচরণ করছে এমন অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। ওই এক/একাধিক শিক্ষার্থীর মতো করে কাজ করতে বা কথা বলতে উপদেশ দেওয়া হয়। এ ধরনের তুলনা শিক্ষার্থীর জন্য অসম্মানজনক, তার আত্মবিশ্বাসের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে এবং দীর্ঘমেয়াদে অপ্রত্যাশিত আচরণ বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করে।
- **নেতিবাচক তকমা দেওয়া:** শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে অনেক সময় তাদের বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক তকমা (labeling) দিয়ে অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ফেলার মাধ্যমে তাদের থেকে প্রত্যাশিত আচরণ অর্জনের চেষ্টা করা হয়। যেমন: অনেক দুষ্ট, বেয়াদব, কথা শোনে না, অভদ্র, বোকা, অসামাজিক ইত্যাদি বলা। এ ধরনের তকমা শিক্ষার্থীর সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব রাখে এবং প্রত্যাশিত আচরণ অর্জনে সহায়ক হয় না। বিশেষ করে অন্য যে কোনো ব্যক্তি, শিক্ষক, অভিভাবক, বা সহপাঠীর সামনে শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে যখন এ ধরনের তকমা দেওয়া হয় তখন তা শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব রাখে।
- **অভিযোগ করা :** অনেক সময় শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ে অন্য ক্লাসের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, বা তার অভিভাবকের কাছে অভিযোগ করা হয়। এ ধরনের অভিযোগের কারণে অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়, সে অপমানিত বোধ করে এবং একইসাথে অভিযোগের কারণে শাস্তির সম্মুখীন হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে শিক্ষার্থীদের অপ্রত্যাশিত আচরণ নিরসনে অন্য শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক বা তার অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা করা যেতেই পারে। তবে সে আলোচনার বা তথ্য সংগ্রহের কারণে শিক্ষার্থীর ওপর যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।

সহায়ক তথ্য-১৮	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশে প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনের ভূমিকা

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখনে বিদ্যালয় ও অংশীজনের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখনে বিদ্যালয় ও অংশীজনের একক ও সমন্বিত ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশ-ক	বিদ্যালয় এবং অংশীজনের সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্র এবং ভুমিকা

বিদ্যালয়ের করণীয়ঃ

- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল শিশুর জন্য শিশু-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- শিশুকে মারবেন না, তাদের বাড়তি যত্ন নিন। এসব স্লোগান প্রচার করবে।
- শিশু সহায়ক শ্রেণিকক্ষ নিশ্চিত করবে।
- নিয়মিত শিক্ষক-অভিভাবক সভার আয়োজন করবে।
- শিশুদের সংবেদনশীলতা বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করবে।
- শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং সেবা সংস্থাগুলোর সাহায্য নিবে।
- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা এবং অধিকার নিয়ে সচেতনতা তৈরি করবে।
- শিশুদের বিকাশ, সুরক্ষা এবং অধিকার নিয়ে মা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক, অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি, হোম ভিজিট ইত্যাদিতে সবাইকে অবহিত করবে।
- সকল শিশুদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সকল ধরনের শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- শিশুর মানসিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অভিভাবক এবং অন্যান্যদের সচেতন করবে।
- চলাচলে সমস্যাসম্পন্ন শিশু (হুইলচেয়ার, ক্রাচ ব্যবহারকারী) কোনো শ্রেণিতে থাকলে সেই শ্রেণিকে অবশ্যই নীচতলায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে সকল ধরনের শিশুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যেন না হয় সেটা নিশ্চিত করবেন, ইত্যাদি।

শিক্ষকের করণীয়ঃ

- উপকরণ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাতে ভারসাম্যতা বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা।
- শ্রেণিতে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে, দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে, সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর ভূমিকাকে সমানভাবে কাজে লাগানো।
- শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বুলিং, উপহাস, কটুক্তি, বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা স্থাপনে উৎসাহিত করা।
- শিশুদের কাছে শিক্ষাকে সহজ এবং আকর্ষণীয় করা।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদি (খেলার মাঠ, বসার ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট ব্যবহার, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা) সকল শিক্ষার্থীর জন্য নিশ্চিত করা।
- পাঠ্য বিষয়, ভাষা ও পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা উপযোগী করে উপস্থাপন করা।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অবকাঠামো (শিক্ষকের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব) যথা সম্ভব তাদের উপযোগী করা।
- এ সকল শিশুকে অবশ্যই তাদের নিজ নিজ নাম ধরে ডাকতে হবে। অন্য কোনো নেতিবাচক শব্দে ডাকা যাবে না।
- তাদের কার কী সমস্যা আছে তা যাচাই বাছাই করে তার জন্য কী করা প্রয়োজন সে পরামর্শ পরিবারের সদস্যদের দিতে হবে। যেমন যদি মনে হয় কোন শিশুর দেখার সমস্যা রয়েছে, তাহলে তার জন্য চশমা কীভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে, যে হাঁটতে পারে না তার জন্য কীভাবে হুইল চেয়ার বা ওয়াকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা ভাবতে পারেন। সে ব্যাপারে পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।
- সব সময় ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং শিশুদেরকে প্রথমে তাদের কথা বা তথ্যটি সম্পূর্ণভাবে বলার জন্য সুযোগ দিন। এতে তারা উৎসাহ পাবে এবং যোগাযোগ করার প্রেরণা পাবে।
- কথা বলার সময় তাদের পছন্দমত কথা বা শব্দ ব্যবহারের সুযোগ দিন। বার বার ভুল ধরবেন না। তাহলে সে কথা বলতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।
- অনেক সময় তোতলা বা অন্য কারণে লজ্জায় কিছু কিছু শিশু যোগাযোগ করতে চায় না। সেক্ষেত্রে এদের লজ্জা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন: শুরুতে তাদের পছন্দমত একজন বা দু'জনের সাথে কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে।
- যে সকল শব্দ বা উচ্চারণ বলতে বেশী সমস্যা হয় অন্য শিশুদের সহায়তায় সেগুলি বেশী করে অনুশীলন করাতে হবে। এক্ষেত্রে শব্দের খেলা জাতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।
- মুখের কিছু কিছু ব্যায়াম করানো যেতে পারে। তাকে সাবান পানি গুলিয়ে সেই পানিতে পাটকাঠি দিয়ে ফুঁ দিতে বলা। ফুঁদিয়ে বল তৈরি করা। একটি বা দুটি স্বরবর্ণ বার বার কয়েকদিন ধরে উচ্চারণ করতে দেয়া; পারলে তার অন্য স্বরবর্ণগুলোও উচ্চারণ করতে দেয়া।
- পাঠের বিষয়গুলি যথাসম্ভব বোর্ডে লিখে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিনের দৈনিক পাঠসূচি দিনের শুরুতেই শ্রেণিকক্ষে লিখে দেয়া যেতে পারে।

- শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ছবি/চিত্র/অংকন/মডেল এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।
- সব সময় শিশুদের দিকে সরাসরি মুখ করে পাঠদান করতে হবে। কথা বলার সময় ঠোঁটের কাজগুলি বুঝতে দিতে হবে।
- সরল, সহজবোধ্য এবং সাবলীল ভাষায় পাঠদান করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কথার পূনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে এ সকল শিশুর বুঝতে কোন সমস্যা না হয়।
- শ্রবণে সমস্যার কারণ হয়তো কানে কম শোনা বা না শোনা। শিশুটির পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন তারা শিশুটির কান পরীক্ষা করে দেখেন সমস্যা কতটুকু। এমন হতে পারে একটি শ্রবণযন্ত্র দেয়া গেলে শিশুটির সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
- দৃষ্টি সমস্যা জনিত শিশুদের অন্য শিশুর সাথে সামনের সারিতে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পূর্ণদৃষ্টি সম্পন্ন শিশু যেন তার পাশে থাকে। ফলে কোন লেখা দেখতে অসুবিধা হলে সে তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে।
- দৃষ্টিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি শিশুদের স্পর্শের মাধ্যমে শেখানো খুবই সহজ। এর জন্য স্পর্শ করার মত উপকরণ তৈরি করে নেয়া যায়। সে ধরনের উপকরণ তৈরি করা কোন কঠিন বিষয় নয়। বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- স্কুলের আঙিনায় মাটিতে গভীর করে বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি দিয়ে লেখা (অক্ষর, সংখ্যা, ছবির ধারণা, বিভিন্ন জিনিসের ছবি) শেখানো যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে সহপাঠিদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
- চলাচলে সমস্যাসম্পন্ন শিশু (হুইলচেয়ার, ক্রাচ ব্যবহারকারী) কোনো শ্রেণিতে থাকলে সেই শ্রেণিকে অবশ্যই নীচতলায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ছড়া, কবিতা ইত্যাদি বেশী বেশী অনুশীলনের মাধ্যমে এদের উচ্চারণ সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পাঠের বিষয়কে বা লেসনকে বেশি বড় না করে যথাসম্ভব ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পাঠ দিতে হবে। এতে সকল শিশুরা সহজে শিখতে পারবে। ধীরে ধীরে পাঠের বিষয়কে বা লেসনকে বড় করা যেতে পারে।
- সব সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং শিশুর কথা সম্পূর্ণভাবে বলার সুযোগ দেওয়া, এতে তারা উৎসাহ পাবে এবং যোগাযোগ করার প্রেরণা পাবে।
- প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাওয়া এবং আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান করা।
- পাঠদান শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এবং কর্মভিত্তিক হবে।
- অকৃতকার্যের জন্য তিরস্কার করা যাবে না এবং যথাসম্ভব বিষয়টি শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে।
- অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
- অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বাবা-মাকে পরামর্শ দেয়া।

শিক্ষার্থীদের করণীয়ঃ

- সহপাঠী শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বুলিং, উপহাস, কটুক্তি, বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি করবে না।

- সকল শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়বে।
- সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে সহায়তা করবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে সামনের সারিতে বসতে দিবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে কথা বলার সময় বাধা দিবে না।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে কখনো প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক বলবে না।

অভিভাবকের করণীয়ঃ

- শিশুদের সকল বাধা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করবেন।
- শিশুদের ভালো ব্যবহার কীভাবে করতে হয় সেসব শিখাবেন।
- শিশুদের সহমর্মী এবং সহযোগিতা করতে শিখাবেন।
- নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।
- নিজের শিশুর সমস্যা শিক্ষককে পূর্বেই অবহিত করবেন।
- ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং বারবার চেষ্টা করতে হবে।
- আন্তরিকতা বাড়াতে হবে।
- মানিয়ে নিবার মানসিকতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অন্য সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে হবে।
- অবহেলা কমিয়ে দিতে হবে।

অন্যান্য অংশীজন (স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান) করণীয়ঃ

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প তৈরি করে দিবেন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজনে হুইলচেয়ার, ক্রাচ ইত্যাদি সরবরাহ করে দিবেন।
- বিদ্যালয়ে গমনের জন্য সকল প্রকারের বাধা দূর করার ব্যবস্থা করবেন।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অসমতার কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:

১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং সুচনা ফাউন্ডেশন (২০২২), একীভূতকরণের কৌশল: শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন।

২। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (১ম খন্ড)।

৪। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), ঢাকা (২০১৪), একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

৫। http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/OS/HSC/hsc_2877/Unit-08.pd

সহায়ক তথ্য-১৯	জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

শিখনফলঃ

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. জেন্ডার বৈষম্য কী ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ধারণা

জেন্ডার (Gender)ঃ

জেন্ডার বলতে মূলত পুরুষ এবং নারীর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভূমিকাকে বোঝায়। এটি একটি সমাজকেন্দ্রিক ধারণা যা মানুষের জীবনধারা, আচরণ, ভূমিকা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুযোগকে প্রভাবিত করে। এই পরিচয়টি মানুষ জন্মসূত্রে প্রাকৃতিকভাবে অর্জন করে না। এটি সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত একটি পরিচয়। সেক্স বা জৈবিক লিঙ্গের মতো জেন্ডারও মানুষকে নারী ও পুরুষ নামক দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে। তাই জেন্ডারকে বলা হয় সামাজিক লিঙ্গ। এটি একটি সাংস্কৃতিক উপাদান।

সমাজ মানুষের সামাজিক আচরণ, ভূমিকা, কার্যাবলি, নির্ধারণ করে দেয় । ফলে সমাজে নারী ও পুরুষের উল্লেখিত বিষয়গুলোতে পার্থক্য থাকে । দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি হলো সেই সমাজের সদস্যদের জেন্ডার নির্ধারণের ভিত্তি। জন্মের পর থেকেই সমাজের এসব রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হবার ফলে একজন মানুষের জেন্ডার পরিচয় তৈরি হতে থাকে । তাই জেন্ডার একটি কৃত্রিম পরিচয়। আর সে কারণেই সমাজভেদে নারী-পুরুষের ভূমিকা, আচার আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক একই ধরনের হয় না। উল্লেখ্য, জেন্ডার পরিচয়ের সাথে মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সংশ্লিষ্টতা নেই, তবে মনঃস্তাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

জেন্ডার এবং জৈবিক লিঙ্গের পার্থক্য-

১. জৈবিক লিঙ্গ (Sex): জন্মের সময় নির্ধারিত হয় এবং এটি পুরুষ বা নারী হওয়ার জৈবিক পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল। উদাহরণ: শারীরিক গঠন, ক্রোমোজোম (XX/XY), এবং প্রজনন অঙ্গ।
২. জেন্ডার (Gender): সমাজ এবং সংস্কৃতির দ্বারা নির্ধারিত ভূমিকা, দায়িত্ব, এবং আচরণ।উদাহরণ: পুরুষদের শক্তিশালী এবং নারীদের কোমল মনে করা, অথবা নির্দিষ্ট পেশা বা দায়িত্বকে লিঙ্গভিত্তিক হিসেবে দেখা।

জেন্ডার সমতা (Gender Equality)

জেন্ডার সমতা বলতে বোঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে নারী ও পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে সবার প্রতি সমান আচরণ করা হয় এবং তাদের সমান সুযোগ, অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত

করা। জেন্ডার সমতা মানে শুধু নারীদের উন্নয়ন নয়, বরং সমাজের সকল লিঙ্গের (পুরুষ, নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গ) মানুষকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমান সুযোগ দেওয়া। এটি একটি ন্যায্য সমাজের ভিত্তি তৈরি করে।

জেন্ডার সমতার প্রয়োজনীয়তা:

মানবাধিকার রক্ষায়: জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এটি নারীর প্রতি বৈষম্য, সহিংসতা এবং অবিচার কমাতে সাহায্য করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে: নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক অর্থনীতি উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক স্থিতিশীলতা: জেন্ডার বৈষম্য এক ধরনের সামাজিক বৈপরীত্য তৈরি করে। সমতার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ভারসাম্য এবং শান্তি বজায় থাকে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে: নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে উন্নতি ঘটে। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করে তোলে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য: জেন্ডার সমতা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) পঞ্চম লক্ষ্য। এটি অর্জন ছাড়া কোনো সমাজ প্রকৃত উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে পারে না।

বৈষম্যের অবসান ঘটাতে:

জেন্ডার সমতা কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি, প্রশাসন এবং দৈনন্দিন জীবনে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে। এটি বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

জেন্ডার সমতা সমাজের একটি মৌলিক প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করতে শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিমালা প্রণয়ন এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। একটি সমতাভিত্তিক সমাজই প্রকৃত শান্তি ও উন্নয়নের পথপ্রদর্শক।

জেন্ডার সাম্য (Gender Equity)

জেন্ডার সাম্য বলতে বোঝায় এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে নারী, পুরুষ এবং সকল লিঙ্গের মানুষের মধ্যে সমান অধিকার, সুযোগ, এবং দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়। এতে কেউ লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার হয় না এবং প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী সমান সুযোগ পায়।

জেন্ডার সমতা এবং সাম্যের মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একই ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির দাবিদার হলেও সাম্যে'র ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জেন্ডারের চাহিদা ও প্রাপ্য অধিকার আলাদা হয়ে থাকে । তাই জেন্ডার সমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চাহিদা আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় না যেটি জেন্ডার সাম্যে'র ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।একটি ন্যায্য ও টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জেন্ডার সাম্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।যেমন: বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হওয়াতে এক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য জেন্ডার সাম্যতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

জেন্ডার সাম্য একটি মানবাধিকার। এটি কেবল নারীর জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। জেন্ডার সাম্য অর্জনের মাধ্যমে সমাজে উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা, এবং সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

জেন্ডার সাম্যের প্রয়োজনীয়তা:

শিক্ষায় সমতা: নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটায়।

লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে সমান অধিকার: কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবন বাড়ায়। সমান মজুরি এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা: নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বাস্থ্যসেবায় সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রজননস্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।

পরিবারে ভারসাম্য: পারিবারিক দায়িত্বের বণ্টনে জেন্ডার সমতা আনলে সম্পর্কের ভারসাম্য ও সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা:

বিপরীত লিঙ্গের মানুষের যে কোনো নির্দিষ্ট, স্বাভাবিক ও ন্যায্য চাহিদা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং ঐ বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির জন্য সেই চাহিদার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং চাহিদাগুলোকে সম্মান জানানোর যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যেকের মাঝে গড়ে ওঠা প্রয়োজন তারই নাম জেন্ডার সংবেদনশীলতা। আরো সহজ করে বললে, নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়াকেই বলে জেন্ডার সংবেদনশীলতা । একজন পুরুষের যেমন সব নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, একজন নারীরও পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে শুধু মেয়ে হওয়ার কারণে কাউকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত না করা এবং ছেলে হওয়ার কারণে বাড়তি সুবিধা না দিয়ে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ ও মর্যাদা দেওয়ার সংস্কৃতিই হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীলতা। যেমন: চাকরি ক্ষেত্রে যদি একজন পুরুষ প্রার্থী ও একজন নারী প্রার্থীর বাহ্যিক, সামাজিক পরিচয় বিবেচনায় এনে কাউকে আলাদা সুবিধা না দিয়ে উভয়ের মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে যিনি অধিকতর যোগ্য তাকে নিয়োগ দেয়া হয় তবে সেক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা গেল।

জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়:

সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা: অনেক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্যের ফলে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষ প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৈষম্য দূর করে এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

সহিংসতা এবং নির্যাতন প্রতিরোধ: লিঙ্গ বৈষম্য এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি এবং বঞ্চনা ঘটে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা সমাজে এই ধরনের আচরণ কমাতে সহায়তা করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে তাদের সঠিক অধিকার পান না বা তাদের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়। সকল লিঙ্গের মানুষকে কাজের সুযোগ দিলে এবং তাদের সামর্থ্যের সঠিক মূল্যায়ন করলে অর্থনীতি উন্নত হয়।

শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসারঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারে জেন্ডার সংবেদনশীলতা শেখানো হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বৈষম্যমুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে ওঠে। এটি মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাঃ লিঙ্গ বৈষম্যের কারণেমানুষ অবহেলা এবং হতাশার শিকার হয়। জেন্ডার সংবেদনশীলতা তাদের মর্যাদা ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়নঃ সমাজে লিঙ্গ সংবেদনশীলতার অভাব থাকলে, আইন ও নীতিমালায় বৈষম্য থেকে যায়। জেন্ডার সংবেদনশীলতা আইন এবং নীতিতে সাম্য নিশ্চিত করে।

অংশ-খ	**জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরনে বিদ্যালয়ের ভূমিকা**

জেন্ডার বৈষম্য (Gender Inequality)

জেন্ডার বৈষম্য হল সেই সামাজিক অবস্থা যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান সুযোগ এবং অধিকার প্রদান করা হয় না। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। উদাহরণ:

- নারীদের শিক্ষায় অবহেলা।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের কম বেতন।
- পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে গুরুত্ব না দেওয়া।

জেন্ডার বৈষম্যের বিভিন্ন প্রকারভেদঃ

স্থানভেদে জেন্ডার বৈষম্য বিভিন্ন প্রকারের হলেও খুব সাধারণ কিছু জেন্ডার বৈষম্য এখানে তুলে ধরা হল-

১. পরিবারে জেন্ডার বৈষম্যঃ

কোন একটি পরিবারে নতুন শিশু জন্মগ্রহণের পর নিকট আত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশী কর্তৃক সন্তান ছেলে না কি মেয়ে হয়েছে তা জানতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে পরিবারে জেন্ডার বৈষম্যের সূচনা হয়। বাংলাদেশের পরিবার গুলোর বহুলাংশে সন্তান ছেলে হলে তার মায়ের সাথে পরিবারের ব্যবহার যতটানা মধুর হয়, মেয়ে হলে সেই একই মায়ের সাথে ব্যবহার হয় ততটাই রূঢ় । বেশিরভাগ পরিবার এটা বুঝতে চান না/ পারেন না যে জৈবিকভাবে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাতা নয় বরং পিতার ভুমিকাই মুখ্য। পারিবারিকভাবে অনেক সময় মেয়ে সন্তানের তুলনায় ছেলে সন্তানের প্রতি বেশি বিনিয়োগ করতে দেখা যায়। বৃদ্ধ বয়সে ছেলেটিই তাঁর অবলম্বন হবে আর মেয়ে তো চলে যাবে অন্যের ঘরে, এজন্য তারা মেয়ে সন্তানের জন্য ছেলে সন্তানের পেছনে বিনিয়োগ করাকেই অধিকতর নিরাপদ ও শ্রেয় মনে করেন আর মা-বাবার এমন মানসিকতাই পারিবারিকভাবে জেন্ডার বৈষম্যের উৎপত্তি ঘটায়।

২. সামাজিক জেন্ডার বৈষম্য

প্রচলিত সমাজে কেবলমাত্র জেন্ডার পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে যে নারী-পুরুষ কিংবা ভিন জেন্ডারের লোকেদের সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণ হয়ে থাকে সেটিই জেন্ডারের সামাজিক বৈষম্য। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময় জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করি। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রায়ই বলা হলেও দেখা যায় যে, নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়া নারীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণর প্রতিকূলতা, হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সর্বদা নারীকে হেয় হিসেবে গণ্য করার কারণ হেতু এ ধরনের বৈষম্য হয়ে থাকে।

৩. পেশাগত বৈষম্য

কেবলমাত্র জেন্ডার পরিচয়ের কারণে যখন একজন ব্যাক্তি তার উপযুক্ত পেশায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন তখন জেন্ডারের পেশাগত বৈষম্য দেখা যায়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের কারণে ব্যাক্তি তাঁর কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান। এতে করে দেখা যায় যে, বিষেশত নারীরা তাদের যোগ্যতা থাকা সত্তেও পুরুষের সমান পরিমাণ বেতন কিংবা সুবিধাদি ভোগ করতে পারেন না। যার থেকে তৈরী হয় জেন্ডার বৈষম্য। ফলস্বরুপ, অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীদের অবস্থান থাকে নাজুক আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এতে করে তাদের আরো সহজভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ ও উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করার সুযোগ পায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য ও সমতা

শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার হলেও বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও রয়েছে নারী ও মেয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার নানা স্তরে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা স্তরে নারীর অংশগ্রহণে ব্যাপক বৈষম্য। শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণের পার্থক্য যা জেন্ডার বৈষম্য নামে পরিচিত তা নানা কারণে সৃষ্ট হয়েছে :

(ক) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
(খ) দারিদ্র
(গ) বাল্যবিবাহ
(ঘ) বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুবিধাদির অভাব
(ঙ) যাতায়াতে নিরাপত্তাহীনতা
(চ) মহিলা শিক্ষকের অভাব
(ছ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে জেন্ডার সচেতন বিষয়বস্তুর অভাব
(জ) শিক্ষকের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণগুলো দূরীকরণে শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হতে হবে Change Agent এর, বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জিত হলেও জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়নি। শিক্ষা উপকরণে সচেতনতা এবং পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পেশা নির্বাচনে, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে, উচ্চপদে নারীর অধিষ্ঠানে, লিঙ্গ সংবেদনশীল উন্নয়ন প্রকল্পে, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণে, উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি প্রকল্পে, যাতায়াত ও বাসস্থানে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক, সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধসম্পন্ন সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা, যা নারী ও পুরুষ তথা প্রতিটি মানুষকে স্বনির্ভর, সক্ষম ও ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে। আর শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ উভয়ের উন্নয়নের জন্য

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং সবার জন্য শিক্ষায় জেন্ডার সমতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নারী-পুরুষ তথা জেন্ডার সমতার মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যমূলক নীতি কাঠামো, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি, যা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন সচেতন নাগরিক। জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর অধিকারের পক্ষে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক তুলে ধরা; সংবিধানে ঘোষিত নারী-পুরুষের সম-অধিকারের ঘোষণা জানানো, নারী-পুরুষ সমতার স্বপক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা/সনদ তুলে ধরা, অনুসরণীয় নারী ব্যক্তিত্বদের উদাহরণ শিক্ষা উপকরণে ব্যবহার করা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি মেনে নারী- পুরুষের সমতাবিষয়ক উদাহরণ টেনে আনা। একই সাথে প্রয়োজন নারী-পুরুষের দায়-দায়িত্ব, কাজ-কর্ম, চাহিদা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকার বিচার করা, পরিবার গৃহস্থালি, জনগণ-এসব ধারণা সুস্পষ্টকরণ, নারী ও পুরুষের সংযুক্তকরণ, নারীপ্রধান কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতাধর্মী বণ্টন নিশ্চিত করার দিকনির্দেশনা বা উপায় খুঁজে বের করা।

শ্রেণিকক্ষে জেন্ডারঃ

শিক্ষক (নারী শিক্ষক ও পুরুষ শিক্ষক উভয়ই) বা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছাকৃতভাবেই শ্রেণিকক্ষ ও স্কুলের জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কিছু নেতিবাচক কাজ করে থাকেন। যেমন–

- প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বা উত্তর প্রত্যাশা করার ক্ষেত্রে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের বেশি প্রাধান্য দেয়া ।
- মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং ছেলেদের যন্ত্রপাতির কাজ দেয়া ।
- ভুল উত্তর দিলে মেয়েদের ও ছেলেদের সমালোচনা ভিন্নভাবে করা।
- সঠিক উত্তর বা কাজের জন্য মেয়েদের ও ছেলেদের বাহবা দেয়ার ক্ষেত্রে তা ভিন্নভাবে করা।
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি দায়িত্ব প্রদান করা (যেমন-ছেলেদের ক্লাসের নেতা বা দলের নেতা বানানো ইত্যাদি।
- পক্ষপাতদুষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা ।
- সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে জেন্ডার বৈষম্য।

এভাবে শিক্ষকরাই অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জেন্ডার পার্থক্য সৃষ্টি করে ফেলেন। শিশুকাল থেকেই জেন্ডার সম্পর্কগুলো মনের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা তুলনামূলক কঠিন হয়ে পড়ে।

শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের কতিপয় কৌশলঃ

- শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায়, বিশেষত দলগত কাজে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমানভাবে সক্রিয় রাখা ।
- আসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ প্রদান।
- ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমানভাবে প্রশ্ন করা।
- ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমভাবে প্রশংসা করা।
- উপস্থাপনের কাজে পর্যায়ক্রমে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ প্রদান।
- জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার।
- জেন্ডার নিরপেক্ষ শিখনসামগ্রী ব্যবহার।

শ্রেণিকক্ষে উপরোক্ত কৌশল প্রয়োগ ছাড়াও শিক্ষক বিদ্যালয়ে 'জেন্ডার বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ' (Gender Friendly Environment) তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রতি অসমতা নির্মূল করা না গেলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কোনো লক্ষ্যই অর্জন সম্ভব হবে না। কারণ প্রতিটি লক্ষ্যই নারীর অধিকার নিশ্চিত করার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও নানাভাবে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে নিরলস কাজ করে চলছে, তথাপি সমতা বিধানে বাংলাদেশকে এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা:

১. শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা
   - বিদ্যালয়ে ছেলে এবং মেয়ের জন্য সমান শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা।
   - স্কুলে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যহীন পরিবেশ তৈরি করা।

২. সচেতনতা বৃদ্ধি
   - জেন্ডার সমতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান।
   - লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
   - পাঠ্যক্রমে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা এবং সাফল্যের গল্প অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. শিক্ষকের ভূমিকা
   - শিক্ষকরা এমন আচরণ করবেন যাতে লিঙ্গভিত্তিক কোনো পক্ষপাতিত্ব না থাকে।
   - নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো।
   - লিঙ্গ বৈষম্যবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা।

৪. সহ-শিক্ষার প্রসার
   - ছেলে এবং মেয়েদের একসাথে শিক্ষা দেওয়া।
   - যৌথ শিক্ষার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি।

৫. বিদ্যালয়ে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা
   - যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।
   - ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য বিদ্যালয়ে একটি নিরাপদ পরিবেশ গঠন।

৬. অভিভাবক ও কমিউনিটির ভূমিকা
   - বিদ্যালয় অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় করে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে কাজ করতে পারে।
   - অভিভাবকদের সচেতন করার মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশেও বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

জেন্ডার বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি স্থান, যেখানে প্রাথমিকভাবে লিঙ্গ সমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের এমন একটি পরিবেশ প্রদান করতে পারে যেখানে তারা লিঙ্গভেদ ভুলে মানুষ হিসেবে একে অপরের প্রতি সম্মান এবং সমান আচরণ করতে শেখে। এক্ষেত্রে নিচে একটি চেকলিস্ট দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে একটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ জেন্ডার রেস্পন্সিভ কীনা তা নির্ণয় করা যাবে। জেন্ডার রেস্পন্সিভ বলতে বোঝায় এমন নীতি, কার্যক্রম বা উদ্যোগ যা সমাজে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এখানে শুধু সচেতনতা নয়, বরং বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

ছক

বিদ্যালয়ে জেন্ডার রেস্পন্সিভ পরিবেশ চেকলিস্ট	হ্যাঁ	না
১. বিদ্যালয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহার করা হয় কি?		
২. বিদ্যালয়ের নারী পুরুষ ও ছেলে মেয়েরা কি জেন্ডার বৈষম্য, হুমকি ও যৌন হয়রানি থেকে নিরাপদ?		
৩. জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হলে নারী পুরষ ও ছেলে মেয়েদের জন্য সহযোগিতার ব্যবস্থা আছে কি? এই সহযোগিতা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ও ছেলে মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?		
৪. বিদ্যালয়ে নারী পুরুষ ও ছেলে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত বাথরুম আছে কি?		
৫. বিদ্যালয়ের সহ:শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমগুলো ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই কি সমান আকর্ষণীয়?		
৬. বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি কি নারী পুরুষ উভয়কে তাদের মতামত প্রকাশের সমান সুযোগ দেয় এবং মতামত দেয়ার জন্য কি সমানভাবে উৎসাহিত করে?		
৭. বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষের সকল কার্যক্রমে ছেলে মেয়ে উভয়ের সমানভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আছে কি?		
৮. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাব, দল ও সংঘের ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই সমান কি?		
৯. নারী ও পুরুষ শিক্ষক উভয়কে সমান মর্যাদা দেয়া হয় কি?		

তথ্যসুত্র:

১। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১), মডিউল-এম ৭০৬, শিশু ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ (২০১৯), ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (প্রথম খন্ড)

৩। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG-5): https://sdgs.un.org/goals/goal5

৪। UNESCO, Inclusive Learning-Friendly Environment, বুকলেট-৪; একীভূত, শিখনবান্ধব শ্রেক্ষিকক্ষ তৈরি

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ